# রোমন্থন

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীন[illegible]
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# মুখবন্ধ

যখন সূর্য্য ওঠে তখন তার আলোক নিয়ে দীপ্ত হয় বহু গ্রহ-নক্ষত্র জ্যোতিষ্ক। কেহ ছিল একেবারেই নিষ্প্রভ, কাহারও বা ছিল সামান্য কিছু আলোর পুঁজি, কেহ বা আপনিই ছিল নিজস্ব প্রভায় সমুজ্জ্বল, তবু একটি সমগ্র মণ্ডলের মণ্ডলপতি সূর্য্যের সমকক্ষ নহে। এমনি বহু গ্রহ-নক্ষত্রে কেন্দ্রস্থ হয়ে যখন সূর্য্য জ্বলে তখন তারাই হয় তাঁহার সৌর জগত।

সৌর-বিজ্ঞানে এটা কতখানি সত্য জানি নে, কিন্তু সাহিত্যে ও কলায় এই ঘটনাই অহরহ হ'তে দেখি। মাইকেল যখন এসেছিলেন তখন সুন্দর মাইকেলী ছন্দে কত না মানুষ লিখতে আরম্ভ করেছিল, আজ কবি-সূর্য্য রবীন্দ্রনাথের তারকানিচয়ে বঙ্গসাহিত্যের মহাগগন সমুজ্জ্বল, তাই বঙ্কিম হেমচন্দ্রের খদ্যোৎমালা আজ বিলীন হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র যখন বঙ্কিমহারা নিষ্প্রভ আকাশে শতচন্দ্র শোভায় উঠলেন বাঙালার মন-প্রাণ হরণ করে, তখন যে বহু শশিতারা সে নভোমণ্ডল খচিত ক'রে দেখা দিল, জগদীশ তাঁদের অন্যতম।

জগদীশ শরৎচন্দ্রেরই গোত্রজ, তাঁরই প্রতিভার মানস-পুত্র। এই বস্তুতন্ত্র সংসারের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা কামনা বাসনার পাঁকে মধুগন্ধ-সুরভিতে অনুপম পদ্ম ফুটিয়ে তোলবার শিল্পী এঁরা। আকাশের আলো যে ধরিত্রীরই অন্ধকারের গর্ভজাত সন্তান, সত্য ও সুন্দর যে মিথ্যা ও অসুন্দরের ত্বকে ঢাকা সুমিষ্ট অমৃত-ফল, তা' এঁরাই মনোজ্ঞ করে মানুষকে দেখিয়েছেন। এই সুন্দরের জগতে পাপ-পুণ্য নাই, আছে জগৎস্রষ্টার অভিনব নব নব রস আর তার বিচিত্র ভিয়ান।

'রোমন্থনে' পল্লীর কদর্য্যতা ক্ষুদ্রতা ও ক্লেদ ফুটেছে একটু বেশি বস্তুতান্ত্রিকতা ঘেঁসে, অপদার্থ ধনী সহুরে বাবু তিনটির আশে পাশে অভয় কালোশশি প্রাণনাথ মদন ও গ্রাম্য মানুষগুলি আসছে যাচ্ছে এক বিচিত্র দৈন্যের ছবি ফুটিয়ে। সুন্দরকে ছেড়ে—বৃহতের মহিমাকে ছেড়ে মানুষ

কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে সঙ্কীর্ণতা ও রিক্ততার পঙ্কে তা' 'রোমন্থনে' দেখানো হয়েছে অপূর্ব্ব করে। মাঝে মাঝে কবিত্বও আছে মন্দ নয়, আর সাহিত্যের পারিপাট্যের তো কথাই নাই। নাই কেবল প্লট।

"স্বামী বলিয়া স্বামীর উপর তার ভক্তি আছে, কিন্তু রক্ষক-হিসাবে আস্থা নাই, সব জানিয়াও নাই; প্রথম পুত্রটির মৃত্যুর পরই তাহা নিরবশিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেছে...প্রতিপালক হিসাবে স্বামীর কতটা মুরদ তাহা প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝিয়া স্বামীর দেহ ক্ষয় হইতেছে, তাহা মাধবীর চোখে পড়ে, কিন্তু বুঝিয়াও নিজের মনের যন্ত্রণার তাড়নায় নিরুপায়ের প্রতি তার ধৈর্য্য থাকে না।" মাধবীর এই ছবিটি এখানে নিখুঁৎ।

তার পর মৃত পুত্রের চিত্র ও তার জন্য কান্নার ছবিটি দেখুন—"দূরে কোথায় কে যেন কাঁদিতেছে···শব্দ আকাশের দিকে খানিক উঠিয়াই নিঃশব্দে থিতাইয়া নামিতেছে···পৃথিবীর যেখানে সচল-অচল সজীব-নিজ্জীব যে বস্তু আছে তাহারই অভ্যন্তরে নিঃশব্দে সে ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে, তারা ছাই হইয়া উড়িতেছে।

সব চলিতেছে, কেবল নির্ব্বাপিত চক্ষু দু'টি স্থির—এত জমাট স্থির যে, তার কূল-কিনারা মাপ-পরিমাপ ওজন-ইয়ত্তা নাই···

স্ত্রীর দিকে চোখ ফিরাইতে তখন সাহস হয় নাই—বুঝি এমন কিছু চোখে পড়িবে যা সে চেনে না।"

জগদীশ গুপ্তের লেখনী সোণার লেখনী, শৈলজা, জগদীশ আদি এমনি কয়েকটি ধ্রুবতারা জ্বলেছে বলেই আধুনিক 'কচি ও কাঁচা'দের এত গর্ব্ব। এ গর্ব্ব অলীক কি করে হবে?

চিত্রভবন
২০শে আশ্বিন, ১৩৩৮

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

# রোমন্থন

## পরিচ্ছেদ ১

সত্যেন্দ্র দত্তের ষ্ট্রীটের ১৭ নং বাড়ীতে সাজ্ সাজ্ রব পড়িয়া গেছে···

রামহরি, লছমন আর কেদার উপর্য্যুপরি একতালা হইতে তেতালায় অধিরোহণ করিয়া তখনই অপর ফার্‌মাইসে একতালায় অবতরণ করিতেছে।

রাশীকৃত চট কিনিয়া চেয়ার প্রভৃতি কাষ্ঠাসনগুলি মুড়িয়া সেলাই করান' হইয়াছে—'লরি' ডাকিয়া সেগুলিকে রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া 'বুক্' করিয়া দিলেই হয়।

সঙ্গে কোন্ কোন্ দ্রব্য লইতে হইবে তিন ভাই তার তিনটি স্বতন্ত্র ফিরিস্তী করিয়া পরস্পর মিলাইয়া লইতেছিলেন···

বড়বাবু বলিলেন,—পিন্-কুশন্‌টা আমাদের কারো ফর্দ্দেই নেই—ও একটা দরকার।

ছোটবাবু বলিলেন,—নিশ্চয়। ওরে—

তৎক্ষণাৎ লছমন আসিয়া দাঁড়াইল; ছোটবাবু বলিলেন,—একটা পিন্-কুশন্ নে আয়, আর এক সেট পিন্।

"যো হুকুম" বলিয়া পয়সা লইয়া লছমন পিন্-কুশন্ আর পিন্ আনিতে গেল।

কাচের গ্লাস, তোয়ালে, ফাউণ্টেন পেন, কালির দোয়াত 'হাফ্ এ ডজন', বুরুশ ( মাথার, জুতার আর দাঁতের )—তিনখানা করিয়া, স্নো, হেয়ার, অয়েল, রেজর, টুথ-পেষ্ট, পিয়ার্স সোপ, জুতার কালি প্রভৃতি খুচরা জিনিষ গুছাইয়া দিবার ভার বড় বউয়ের উপর আছে।

তিনি ফর্দ্দের সঙ্গে মিলাইয়া প্রত্যেকটি দফায় ঢেঁরা দিয়া দিয়া তিনটি এ্যাটাচিতে সমস্ত জিনিষ তুলিয়া দিয়াছেন ; ও-দিক্‌টায় একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে।

ইঁহাদের উদ্যোগ উদ্বেগ আড়ম্বর দেখিয়া মনে হয়, কোথাও যুদ্ধ বাধিয়াছে—ইঁহারা তিন ভাই সেই যুদ্ধে চলিয়াছেন, এবং বরফ এবং আইসক্রীম সদ্যঃই সঙ্গে লওয়া যাইতেছে না বলিয়া ইঁহাদের মনস্তাপের অন্ত নাই।

মা আসিয়া বলিলেন,—সঙ্গে নিচ্ছিস্ কাকে ?

বড় পুত্র বলিলেন,—রামহরি যাবে।

—ও আবার নড়াচড়ার কাজে তেমন পটু নয়। শিল নোড়া দিয়ে ওকে বসিয়ে দাও, তেন-সের তেজপাতা পিষে তুলবে।

—সেখানে ত' ছুটোছুটির কাজ বিশেষ থাকবে না।

মা বলিলেন,—ঝিকে মসলা বাছতে বসিয়ে দিয়েছি ; ধুয়ে বেছে দেবে।

বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন,—ও-সব থাক্, মা ; ওতে ত' আমাদের শেষ পর্য্যন্ত চলবে না।

—ফুরুতে ফুরুতে সরকার-মশাইকে দিয়ে আবার পাঠিয়ে দেব।

যে নোংরা ডালপালা সমেত জিরে-মউরীগুলো বিক্রী হয়, তা' খেলেই অসুখ করবে।

ছোটবাবু বলিলেন,—কিছু মাখন নিলে হ'ত।

অম্‌নি রামহরিকে ডাক পড়িল—

কাহারো ইচ্ছা এখন অপূর্ণ থাকিলে যেন একটি দুঃখের দহন আমরণ সহ্য করিতে হইবে···

রামহরি টাকা লইয়া কৌটার মাখন আনিতে গেল···তখন-তখনই আনিতে হইবে—বিলম্বে বিস্মৃত হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

মেজবাবু বলিলেন,—বিছানার চাদর, রুমাল আর বালিসের অড়্‌গুলো ধুয়ে এসেছে ত', মা ?

মা বলিলেন,—এসেছে ; বড় বৌমার হাতে দিয়েছি।···বড় বৌমা ত' তার বা এখনো থামায়নি রে ; সে যাবে বল্‌ছে।

বড়বাবু বললেন,—পরে। আমরা গিয়ে রকম-সকম বুঝি, তারপর লিখ্‌ব ; গিয়ে কিছুদিন থেকে আস্‌বে।

—তোদের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে।—ছোট'র ত' বিছানার চাদর শোবার আগে ঝেড়ে না দিলে সে রাত্রে আর ঘুম হয় না।—তুই কেন যাচ্ছিস্‌—তুই থাক্‌। বলিয়া গৃহিণী ছোট ছেলের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ছোটবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—ঐ করেই ত' তোমরা মায়েরা বাঙালী ছেলের মাথা খাও···

যেন সে মাথা খাইবার চেষ্টাকে চিরকাল প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ আদর লইতে চাহে নাই।

গৃহিণী হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন,—ভাল করে' ভেবে দেখ্—কিছু দরকারী জিনিষ নিতে ভুল হ'ল না ত'। সেখানে গিয়ে আবার মুস্‌কিলে পড়্‌বি!

তিন ভাই-ই সমস্বরে বলিলেন,—কিছু ত' মনে পড়ছে না…

বড়বাবু স্বতন্ত্রভাবে বলিলেন,—সেবার…বলিয়া সুরু করিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এই যে, সেবার শিলং-এ যাইয়া যাত্রার পূর্ব্বকালীন তাঁহারই দূরদর্শিতাবশঃতই কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই; সেই সূত্রে বড়বাবু কিছু আত্ম-প্রশংসাও করিলেন—

কিন্তু তাঁর দর্পহারী ভগবান ছিলেন তাঁর মায়ের মনে; মা বলিলেন,—সান্‌লাইট্ সোপ্ নিয়েছিস্?

বড়বাবু জিব্ কাটিলেন—

মা বলিলেন,—ঐ দেখ্…রুমাল তোর দু'বেলা কাচ্‌তে হয়—কি মুস্কিলেই পড়ে যেতিস্!

তৎক্ষণাৎ দু'ডজনের দাম দিয়া কেদারকে দোকানে পাঠান হইল।

এই ভুলটা ধরা পড়ায় তিনজনেই চিন্তান্বিত হইয়া বৈঠকখানায় নামিলেন—তবে এখনও ছত্রিশ-ঘণ্টা সময় হাতে আছে।

ব্যাপার যৎসামান্যই—

কিন্তু হুলস্থুল তোড়জোড় দেখিলে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বাবু-তিনটির পিতৃদেব জীবিত নাই; জ্যেষ্ঠতাত আছেন এবং তিনি আজ একযুগ—বার বৎসরে একযুগ—ইংলণ্ডে প্রবাসী। পত্রযোগে তিনি কুশল-সংবাদ প্রদান এবং গ্রহণ করেন। পূর্ব্বের ডাকে তাঁহার

যে-পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার আসনপ্রার্থী হইতেছেন।

এবং সেই পত্রেই, কি কারণে কে জানে, ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে তিনি আদেশ করিয়াছেন—"পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাও।" সেখানে যাইয়া কি করিতে হইবে তাহার "প্রোগ্রাম অর্থাৎ খসড়া এবং ছক্" তিনি গ্রামের ঠিকানাতেই পরে পাঠাইবেন লিখিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে মাননগর গ্রামে ইঁহাদের আদি নিবাস, ইঁহাদের পিতামহ সেই পল্লী-ভবনের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এবং তাঁহার পত্নীও চিতায় ওঠেন কলিকাতায়—কৃতী-পুত্রের গৃহে কর্ত্তৃত্ব করিতেন তাঁহারাই।

যাহা হউক, চিরকুমার এবং অত্যন্ত ধনবান জ্যেষ্ঠতাত বিলাত হইতে যে আদেশ করিয়াছেন তাহা অমান্য করা যায় না।

কলিকাতা কম্পিত করিয়া তাই এই আয়োজন আর দৌড়াদৌড়ি, আর তার সঙ্গে এই জগদ্ব্যাপী দুশ্চিন্তা।

তিন ভাই বৈঠকখানায় নামিয়া দেখিলেন, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-পাঁচটা, আর ডাক্তার মনোজবাবু এবং 'বাস-ওয়ালা' ক্ষিতিনাথবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন, প্রত্যহই তাঁরা সাড়ে-পাঁচটায়, যেখানেই থাকুন, এইখানে আসেন।

ডাক্তারের সাইকেল দেখিয়াই ছোটবাবুর মনে পড়িয়া গেল, তাঁহাদের সাইকেল তিনখানা 'ওভারহল্' করিতে দোকানে দেওয়া হইয়াছে।

লছমনকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দোকানে পাঠাইয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, কড়া তাগিদ্ দিয়ে আসবি—কাল বিকেলে'ই চাই।

মনোজবাবু বলিলেন,—যাচ্ছ ত' আশা করে' আর আড়ম্বর করে', আব্‌হাওয়া জান কি দেশের?

বড়বাবু চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিলেন,—কেন, কি রকম আব্‌হাওয়া সেখানকার?

—জানিনে তা', তাই জিজ্ঞাসা করছি; সে দিকে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছ কি না!..."লুক্ বিফোর ইউ লিপ।"

মেজবাবু বলিলেন,—মায়ের ভুল হবার যো নেই। তিনি সরকার-মশাইকে পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছেন, সেখানকার স্বাস্থ্য ভালই চলছে।

মনোজবাবু বলিলেন,—কিন্তু 'জার্ম' লোকের বিছানাতেই বজ্‌বজ্ করছে—বিছানা ত' কাচে না, রোদে দেয় না কোনো কালে!... আত্মীয়তা করে' হঠাৎ তাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠো না যেন।

বড়বাবু বলিলেন,—না, তা' উঠ্‌বো না।

—কিছু ওষুধ নিয়ে যেও; পিত্তনাশক আর মৃদু-বিরেচক ওষুধ দিয়ে কুইনিনের কয়েকটা পিল করে দেবখন্, নিয়ে যেও।

বড়বাবু বলিলেন,—তা' যাবো।

—মশারি নিতে ভুলো না—পাড়া-গাঁয়ের মশা খুব সেয়ানা; খুব শক্ত মশারি নিও, যেন সূতো ঠেলে ঢুক্‌তে না পারে।

বড়বাবু বলিলেন,—আচ্ছা।

—চানও করো গরম জলে, জল ফুটিয়ে।

বড়বাবু বলিলেন,—হ্যাঁ।

ক্ষিতিনাথ বলিলেন,—শুনেছি পাড়াগাঁয়ে এমন ইঁদুর আছে যার ন্যাজের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিছুটির বিষ—ন্যাজটা যদি একটিবার মানুষের গায়ে ছোঁয়াতে পেরেছে তবে গা-চুল্‌কেই মানুষ বেচারা মারা যাবে।

ডাক্তার মনোজবাবুর ডাক্তারী কথায় বড়বাবু অবোধের মত সায় দিয়া চলিতেছিলেন—যেন বৃহত্তর ব্যক্তির নিকট বালক প্রথম শিক্ষা লাভ করিতেছে—কোনো কথায় 'না' বলিলেই শিক্ষক চোখ রাঙাইবেন।

কিন্তু ক্ষিতিনাথবাবুর ইঁদুরের কথায় বড়বাবু হাসিয়া ধমক্ দিয়া প্রতিবাদ করিলেন ; বলিলেন,—ধেৎ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার অভিজ্ঞতা তোমাদের মত নয় ; তোমাদের পশ্চিম তো লিলুয়া আর পাড়াগাঁ বিদ্যেসাগর বাটী। আমার মামার শালার বাড়ী যজ্ঞিনগর—আমি গিয়েছি সেখানে, দেখেছি সে ইঁদুর। বর্ণনা নেও না আমার কাছে—সমস্ত গা কটাসে—পিঠের ওপর তিনটে কালো দাগ·· ন্যাজ এই ঝাঁকড়া ··তার চোখের তারা কপালের সিকি ইঞ্চি ওপরে—

মনোজবাবু বলিলেন,—তুমি কাঠবেড়ালী দেখেছিলে—তাদেরই পিঠের ওপর কালো তিনটে দাগ থাকে।

ক্ষিতিনাথ কিছুমাত্র দমিলেন না—

বলিতে লাগিলেন,—তা' ছাড়া বুনো বেড়াল আছে আবার একরকম, চিড়িয়াখানায় সে 'স্পিসিস্' নেই—তার থাবার এমনি জোর যে, কাঁটাল গাছের গুঁড়ি ধরে নাড়া দেয় আর এঁচড়গুলো বোঁটা ছিঁড়ে ধপ্ ধপ্ করে' মাটিতে পড়ে···

বড়বাবু শুষ্কমুখে বলিলেন,—মানুষ মারে তারা ?

—বাগে পেলে ছাড়ে কি !·· আমার মামার শালার আট বছরের ছেলে ন্যাড়াটাকে তাড়া করেছিল একদিন। বলিয়া ক্ষিতিনাথ বাঘ লাফাইয়া শিকারের উপর যেমন করিয়া পড়ে তাহারই একটা অক্ষম অনুকরণ করিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন,—বন্দুকটা নিতেই হবে।

চা আসিয়া পড়িল—·

এবং ছু'-এক মিনিট অগ্রপশ্চাৎ গণনাথ, ক্ষেত্রমোহন, সতীভূষণ প্রভৃতি আসিয়া পড়িলেন—চায়ের সভায় নিত্য তাঁহারা উপস্থিত থাকেন।

গণনাথ চায়ের কাপ তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—তোমার জ্যাঠা-মশায়ের উদ্দেশ্যটা কি ?

ভ্রাতুষ্পুত্রগণ কি জবাব দিতেন তার ঠিক নাই—

তাঁহাদের হইয়া মনোজ ডাক্তার বলিলেন,—পার্লামেণ্টে সিট্ না পেলে তিনি দেশে ফিরবেন ; ইণ্ডিয়ায় এসে কলকাতায় তিনি বাস করবেন না—দেশের বাড়ীতে থাকবেন ; ভাইপোদের দিয়ে আগে তার স্বাস্থ্য পরখ্ করে নিচ্ছেন ; আর বাড়ীটাতে বহুদিন লোক বাস করেনি, —তারও একটা ঠেকা আছে, তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে কিছুদিন মানুষ বাস করিয়ে নিচ্ছেন।

শুনিয়া তিন ভাইয়ের তাক্ লাগিয়া গেল—

বড়বাবু বলিলেন,—তাই কি !

—কিম্বা এখানকার খবরের কাগজের হুজুগটা তিনি ধরে' নিয়েছেন ; দেশের উপর তাঁর দরদ আছে যথেষ্ট জানি।—বলিয়া সতীভূষণ পুনরায়

বলিলেন,—পল্লীগ্রামে নিরিবিলি আরাম কত! তবে টেকা কঠিন··· সহরের লোক পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কেবল তুলনা করে' কষ্ট পায়—তার অর্দ্ধেক আত্মা পড়ে' থাকে সহরে।···তবে অসুখ বিসুখে—

—ক'লকাতা থেকেই ডাক্তার চালান্ দে'য়া যেতে পারে—এই ত' বিয়াল্লিশ মাইল রাস্তা! আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক যে সঙ্কটে আছে তার অংশ দেখেই অত' ভয় পাওয়া ঠিক্ নয়।—বলিয়া ক্ষেত্রমোহন হাসিতে লাগিলেম।

জ্ঞানচন্দ্র বলিলেন,—আমি একবার গিয়েছিলাম ক'লকাতার বাইরে একটা কাজে···অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম···সকাল বেলা পৌঁছে বৈঠকখানায় ব'সে আছি, গৃহকর্ত্তাও আছেন···তিন-চারটে ছেলে-মেয়ে এল, বোধ হয় আমাকেই দেখ্তে; কর্ত্তা জিজ্ঞাসা কর্লেন, ওরে পিল্ খেয়েছিস্? তারা কেউ বল্লে, একটা খেয়েছি, কেউ বল্লে দু'টো খেয়েছি। "এখন মুড়ি খেগে যা"—বলে কর্ত্তা তাদের ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন।

ছোটবাবু বল্লেন,—আপনি জ্বর নিয়ে ফিরে এসেছিলেন বুঝি?

—হ'ত, কিন্তু দৈবাৎ বেঁচে গিয়েছিলাম।···কর্ত্তা বল্লেন, আপনি চান্ ক'রবেন না··আমি বল্লাম, চান্ না করে' আমি খেতে পারিনে।···চান্ কর্তে গেলাম—খুব ঘটা করেই যাওয়া গেল; ভদ্দরলোক তাঁর চাকরটাকে আমার সঙ্গে দিলেন—আমার টাওয়েল আর ধুতি আর চটি বগলে করে' সে আমার সঙ্গে এল।· পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে খানিক্ কি ভাবলাম জানিনে—জল টল্টল্ করছে দেখলাম, আর গা সিরসির করছে বোধ হ'ল···কিন্তু জলে পা-নামাতেই তলা

থেকে কি যে উঠ্‌তে লাগ্‌ল' জানিনে...জলে নামার নিষেধ জলের তলাতেই ছিল—প্রথমে জলের নীচেয় একটা বিজ্‌বিজ্‌ শব্দ হ'ল···তারপর খানিকটা কালো রঙের পাঁক উঠে জলটা ঘুলিয়ে গেল—আর এমন একটা গ্যাঁজা-গন্ধ নাকে এল···

বলিয়া জ্ঞানচন্দ্র নাক সিট্‌কাইয়া রহিলেন।

—তারপর ?

—চান করা আর হ'ল না···পরের ট্রেণেই দে দৌড়।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন,—জলের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ে' গেল···পাড়াগাঁয়ে আর একটী উৎপাত আছে।

ছোটবাবু। কি উৎপাত ?

—তোমাদের বাড়ী কি নদীর ধারে ?

—হুঁ।

—জলে নেম' না খবরদার।···এক চাষী কোথায় যেন পাট ধুয়ে জল থেকে উঠে' দেখে একটা জোঁক্‌ তার নাইয়ে এক মুখ লাগিয়ে কোমর বেড়ে' ও-মুখটাও নাইয়ে লাগিয়েছে, আর এত রক্ত খেয়েছে যে, লোকটা অল্পক্ষণ পরেই অজ্ঞান হ'য়ে গেল···

মেজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—ড্যাঙায় ওঠে না তারা ?

—না।

সতীভূষণ বলিলেন,—ঘাসে ঘাসে বেড়ায় এক রকম জোঁক ; তারা অত' মারাত্মক নয়—গরু বাছুরের নাকে লাগে খুব।

মনোজ ডাক্তার বলিলেন, বেতো'-রুগীর ব্যথার জায়গায় জোঁক লাগায় শুনেছি—সে বোধ হয় ঐ জলের জোঁক···যত টানো তত সে লম্বা হবে।

—আহা, কেন ভয় দেখাচ্ছ' ওদের! বলিয়া ক্ষিতিনাথ হাসিতে লাগিলেন।

বড়বাবু বলিলেন,—না না; আর কি কি বিষয়ে সাবধান হ'তে হবে, যার যা' জানা আছে বলো।—বলিয়া বড়বাবু উপদেশের জন্য সকলেরই মুখের দিকে চাহিলেন।

গণপতি বলিলেন,—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ক'রো।—তবে সেখানকার মানুষ কেমন তা' কারুরই জানা নেই···তারা উল্টে' কোঁৎকা না হ'য়ে ওঠে এইটে দেখো।

ছোটবাবু বলিলেন,—মানুষকে আমাদের ভয় নেই।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন,—তোমরা এগোও···আমরা সদলবলে গিয়ে পড়্‌ব একদিন—শিকার খুব মেলে শুনেছি—বালহাঁস, চকা, জংলা-শুয়োর···

ছোটবাবু বলিলেন,—বন্দুক আমি নিচ্ছি।

মনোজ ডাক্তার বলিলেন,—থার্ম্মমিটার নিয়েছ ত' একটা?

—ইস্।—কেদার? লছমন? রামহরি?

লছমন ছিল না—

কেদার আর রামহরি দু-দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিল—

ছোটবাবু বলিলেন,—মা'কে বল্ গিয়ে, একটা থার্ম্মমিটার নিতে হবে।

বড়বাবুর সেই শিলং যাত্রার পূর্ব্বকালীন দৃষ্টি-কুশলতা নাই। তিনি মনস্থ করিলেন, আর একবার তিনজনে মিলিয়া ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

চা-পান শেষ করিয়া এবং 'বিভূঁয়ে' উহাদের খুব সাবধানে থাকিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বন্ধুগণ প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে বড়বৌ বড়বাবুর কাছে ধন্না দিয়া ফল পাইলেন না—তাঁর আয়ত চক্ষু দু'টি জলপূর্ণ হইয়া রহিল, এবং বড়বাবুর রাক্ষস-প্রকৃতি জোঁকের গল্পে তিনি কর্ণপাতও করিলেন না।

বড়বৌ, বড়বৌ হইলেও তাঁর বয়স মাত্র সপ্তদশ বৎসর।

# পরিচ্ছেদ ২

"লোক্যাল" ইন্দ্রালয় ইষ্টকালয়ে রাজমিস্ত্রী এবং উঠানে মজুর লাগিয়াছে দেখিয়া অভয় ভিতরে গেল ; দেখিল, একখানি বহুমূল্য পালঙ্কে বার্ণিস্ লাগান হইতেছে। দেখিয়া অভয়ের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিল—কিন্তু হাসি সেটা নয় ; হাসির আভা থাকে, প্রবাহ থাকে, বিস্তৃতি থাকে, কিন্তু অভয়ের ঠোঁটের সেই আন্দোলনে সে সব কিছু নাই—যেন ভিতরের একটি অনির্ব্বচনীয় ভাব-নির্গমের একটা নির্ব্বিকার পথ সেটা ; বিকার যা' তা' ভিতরে।

অভয়ের পিতা অঘোর প্রথম বয়সে হাসিয়াছিল—তাহাকে হাসি বলা যায়···সুকুমার ঋজু স্বচ্ছ রেখাপাত করিয়া সে হাসি ফুটিত—আয়াসহীন অথচ প্রচুর···সে হাসি বিকশিত হইয়া মানবাত্মার চিরন্তন সন্তোষের মাঝে একটি কল্যাণের মূর্ত্তিতে মুদ্রিত হইয়া যাইত···জগৎ-লক্ষ্মীর হাসি সেই হাসির অঙ্গে প্রতিফলিত হইত ; সে হাসিতে কপট কলাবত্তা ছিল না, কিন্তু উন্মোচিত বক্ষের অহৈতুকী উদারতা ছিল।

সে হাসি তার প্রৌঢ়াবস্থায় বক্র হইয়া উঠিয়াছিল। হাসির শৈশব আছে, যৌবন আছে, বার্দ্ধক্য আছে, কিন্তু হাসি যখন অসহায় হইয়া আতঙ্কে বাঁকিয়া চুরিয়া দেখা দেয় হাসির তখন মুমূর্ষু অবস্থা—অঙ্গুরীর

মত চতুর্দ্দিকে নিরন্ধ্র কারায় বেষ্টন করিয়া অন্ধকার যখন দীপ-শিখাটিকে বায়ুর তীর মারিয়া মুহুর্মুহুঃ আঘাত করিতে থাকে, এ হাসি তখনকার সেই দীপশিখাটির মত—মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে ··

চিতার অঙ্গারে একবিন্দু অগ্নির মত নিৰ্জ্জীব এবং করুণ একটি হাসি পুত্রকে প্রদান করিয়া অভয়ের পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিল—ঐটিই ছিল তার উন্মথিত জীবনের সার বস্তু···

পিতার দেওয়া হাসিটি অভয় ধারণ করিয়াছে···

এই হাসিটী বহুদিনের, প্রায় পঁচিশ বৎসরের পুরাতন। অভয়ের পিতা সত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন করে; কিন্তু নিজের এই দীর্ঘায়ু করুণাময়ের শুভ-দান বলিয়া আদরের চক্ষে অঘোর তাহাকে দেখে নাই।···অভয় দেখিত কেবল বাপের মুখের তীব্র হাসির ভঙ্গীটি—যমের কর্ণে কুণ্ডলের দ্যুতির মত ভয়াবহ সেই হাসি।

এরা চাষী পরিবার। মাটীই ইহাদের লক্ষ্মী, জননী; জননীর স্তন্যের মত মাটির বুকের শ্যামল রস-উৎসই ইহাদের জীবন···যখন আনন্দ আসে তখন মাটির স্বর্ণোজ্জ্বলা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আসে···যখন লুটাইতে হয় তখনও এই মাটির উপরেই বুক চাপিয়া লুটায় তারা—মাটি তাদের চোখের জল, বুকের আগুন শুষিয়া লয়। ত্রাসে অন্ধকার দেখিয়া চোখের পাতা যখন অবশ হইয়া বুজিয়া আসে তখনও মাটির জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিরই তারা ধ্যান করে···

জগন্মাতাকে মনে করিতে তাদের মাটিকেই মনে পড়ে···দশভুজা প্রতিমা মৃত্তিকার; কালী, তিনিও মাটির; সব একাকার—মাটী ছাড়া আর কিছু নাই···

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে মাটির রূপে স্বর্গ আলোকিত হয়; দশভুজার দশহস্ত দশদিকে প্রসারিত হয়···

কিন্তু সেদিন আর নাই—সেদিনের কথা ভাল করিয়া স্মরণই হয় না; মাটির ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া তার রুক্ষ মূর্ত্তিই দিগন্ত পর্য্যন্ত ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে—তাহাতে প্রাণ নাই···

অভয়ের পিতা পৃথিবীর এই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া একটু হাসিত, দেখিয়া লোকে ভয় পাইত; কিন্তু অভয় মানুষকে ভয় দেখাইতে বাপের স্মরণীয় হাসিটি আপন ওষ্ঠে স্থাপিত করে নাই—ভিতর হইতে সে হাসি আপনিই আসিয়াছে।

বাপ যখন মারা যায় তখন অভয় বুঝিত সবই; পয়সার অভাবে রোগীর চিকিৎসা হয় নাই, রোগী উপযুক্ত পথ্য পায় নাই।

•

অভয় শুনিয়াছিল, বাবুরা তিনভাই তাঁহাদের পল্লীভবনে আসিবেন।

যে লোকটি পালঙ্কে বার্ণিশ লাগাইতেছিল সে একবার মুখ ফিরাইয়া অভয়কে দেখিল; তারপর নিজের কাজের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—বস···শুয়ে একটু ঘুমোবে কেবল, তারই জন্যে খরচ কত, তার আওয়াজ কত!

অভয় চৌকাঠের উপর বসিয়া বলিল,—হবে না! ওঁরা ভাবেন কত!

অভয়, গুজব নয়, ভুক্তভোগীর মুখেই শুনিয়াছিল, বাবুরা কলিকাতায় থাকিয়াও পল্লীর কথা ভাবিয়া একদিকে গলদ্‌ঘর্ম্ম অন্যদিকে দিশেহারা হইয়া যান—হামেসাই তাঁদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।

রঙের মিস্ত্রী বলিল,—ভাবেন বই কি। মাথা আছে ভাবেন ; পা থাক্‌লে ছুট্‌তেন, হাত থাক্‌লে লুফ্‌তেন···

—কি ?

—কদলী। বলিয়া লোকটি অভয়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—ভাল করে' বস'। তামাক খাই।

কিন্তু অভয়ের আর বসিবার ইচ্ছা রহিল না। বাবুদের প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না থাকিলেও এমন অন্ধ-আক্রোশ নিশ্চয়ই ছিল না যে, প্রকাশ্যে তাঁহাদের উদ্দেশে সে কদলী প্রদর্শন করিতে পারে। তার ভদ্র-অন্তরের কাছে বেতনভোগী মিস্ত্রীর এই অকারণ কটূক্তি অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে হইল ; বলিল,—তুমি খাও, আমি আসি। বলিয়া সে উঠিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

—চল্লে ? এই গ্রামেই বুঝি তোমার বাড়ী ?

—হুঁ। তোমার ?

—আমার বাড়ী গোয়াড়ী।···এই জঙ্গলে আমায় পাঠিয়েছে খাটে বার্ণিশ আর কাঠে রং করতে ! তাতেই ত' রাগ করছি। না আছে খাবার দিশে, না আছে শোবার সুখ।···মশা কত ! দিনমানেও—সত্যি সত্যিই উঠ্‌লে যে হে !

—হ্যাঁ, যাই। বাবুরা আস্‌বেন কবে ?

মিস্ত্রী মুখে কিছু বলিল না ; রং-মাখা হাত নেতি সমেৎ উল্টাইয়া দিশেহারার ভঙ্গী করিল···তারপর জিজ্ঞাসা করিল,—এ বাড়ী কতদিনের জান ?

—এক শ' বছরের হবে।

দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে একবার উৎক্ষিপ্ত করিয়া মিস্ত্রী—বলিল,—সেকেলে কাঠ কিনা—কড়ি বরগা ঠিক আছে।···এ বাড়ীতে লোক ঢোকেনি কতদিন ?

—বছর দশ-বার হবে।

—এবার যে বড় দয়া হ'ল ! গরজ আছে বুঝি ! বলিয়া চতুর ঠাট্টার সাড়া না পাইয়া মিস্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, আগন্তুক চলিয়া গেছে।

বাবুদের আসিবার কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে অভয় বাড়ীর দিকে চলিল···কাহারও দরদ কেহ যাচিয়া চায় না, কেহ কাহারও উপকার যাচিয়া করিতে আসে না···

অভয় হাঁটিতে হাঁটিতে যাইয়া নদীর ধারে দাঁড়াইল। দক্ষিণে বামে দুইদিকে আর সম্মুখে 'যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর ব্যাপিয়া ব্যর্থ কৃষিকার্য্যের অখণ্ড শূন্যতা ধূ ধূ করিতেছে···যে ফসল জন্মিয়াছিল তাহা পণ্ডশ্রম করিয়া কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই ; গরু লাগাইয়া দিয়া লোকে তাহা কাঁচাই খাওয়াইয়া দিয়াছে—ভোজনাবশিষ্ট শুষ্ক ডাঁটা আর লতা ক্ষেত্রের উপর লুটাইয়া আছে—

অভয়ের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল—

পাছে আশাহত সন্তানের সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া যায় এই ভয়েই যেন ভূমিলক্ষ্মী সর্ব্বাঙ্গের উপর আবরণ টানিয়া দিয়াছেন···

কিন্তু আগে এমন ছিল না—ভূমিলক্ষ্মীর মুখ লুকাইবার হেতু ঘটিত না···সর্ব্বসম্পদের পুরোভাগে আর সর্ব্বসুখের সমষ্টির কেন্দ্রে তিনি প্রধানতম স্থানটিতে অধিরোহণ করিয়া বিরাজ করিতেন।···

বাল্যকালে নদীর ধার—এপার আর ওপার—তাদের অতি প্রিয় ছিল···

এখনও হাতে কাজ নাই, তখনও হাতে কাজ থাকিত না···

অভয় ও-পারের দিকে চাহিয়া রহিল···

ওই খানটিতে জলের ধারে বরাবর উজান দিকে রসিকপুরের বাঁকের মুখ পর্য্যন্ত ঝাউয়ের বন ছিল···বর্ষার জলের কাদা গাছের সরু ডাঁটায় শুকাইয়া থাকিত · ঘাটে বাঁধা পরের নৌকায় অকারণেই নদী পার হইয়া সেই ঝাউ বনে তারা বিচরণ করিত ; তার ভিতর লুকোচুরি খেলা বেশ চলিত··সির্ সির্ শব্দটা যে উঠিত, কোথাকার একটা ম্রিয়মাণ সুরের সঙ্গে তার মিল থাকিত···নদীর ধারে বসিয়া জলের স্রোতের ভিতর হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিয়া বসিয়া থাকা—অশেষ কৌতুক তাতে···স্রোতের টানে পায়ে টান্ লাগিয়া রক্তে যেন সুড়্সুড়ি লাগিত···ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া কোথাকার আবর্জ্জনা পায়ের সঙ্গে জড়াইয়া আট্কাইয়া পড়িত···একটা লম্বা খড় পা বেড়িয়া দুই মুখ স্রোতের দিকে ভাসাইয়া দিয়া থর্থর্ করিয়া কাঁপিত ··

সে ঝাউবন নাই—

অভয়ের মনে হইলে পল্লীর ক্রোড় নিঃস্ব করিয়া যত কিছু সামগ্রী একে একে বিচ্যুত হইয়া গেছে, তাহাদের সকলের বড় বাল্যকালের সেই ঝাউবনটি···

স্মৃতি কত আসে, কিন্তু তারা নিরীহ ; নির্জ্জীব বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিতে চায়···প্রেতমূর্ত্তির সে মূক—মুখে তার ভাষা নাই—মনকে সে বিচলিত করে না।

তখন কত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ইচ্ছার কল্পলোক এখন অন্ধকার, অচঞ্চল···যখন সুখের দেবতা মৌনাবলম্বী হইয়া একেবারে মুখ ফিরান্ নাই, তখন কৈশোরের স্মৃতি এতটুকু হাসির আকারে, গানের দু'টি কলির সুরে চম্‌ক্ দিয়া যাইত···একটি রেখায় জীবনের এই দু'টি যুগ যুক্ত ছিল —উষার সঙ্গে অপরাহ্নের যেমন দৃষ্টির যোগ থাকে।···তখন সে স্মৃতির শক্তি ছিল—

কিন্তু আজ তার মূল্য নাই; মৃতের আত্মা যেমন দূর হইতে পরিত্যক্ত দেহটাকে দেখে তেমনই নিরর্থক দৃষ্টি লইয়া মাঝে মাঝে স্মৃতির জগতে চিত্ত ধাবিত হয় ··

সেদিন আবার যদি ফিরিয়া আসে!—

মনে হইতেই অভয় শিহরিয়া উঠিল···

সেই রৌদ্র আর নদীতীর· চিরদিন নীরব; হঠাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মানুষের হাহাকার নদীর দুই তীর হইতে নদীর বুকে আছড়াইয়া পড়িল ··তার নির্গমের পথ নাই—উপরে আকাশ, নিম্নে মাটি···মধ্যবর্ত্তী স্থানটি পরিপূর্ণ করিয়া সেই হাহারব অভয়ের চক্ষের সম্মুখে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল···

অভয়ের মনে হইল, সেদিন ফিরিয়া আসিলেও তার নাগাল পাওয়া যাইবে না—মধ্যে একটি শুষ্ক হাহাকারের মরুভূমি রহিয়াছে।

প্রকৃতি গতায়ুঃ—

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে হয়, মৃতের ছবি দেখিতেছি; সে-ই অবয়ব; কিন্তু তাহার সঙ্গে হৃদ্যতা চিত্তবিনিময় ঘটে না···

ইহার স্বকীয়ত্ব আর সৌন্দর্য্যের অনুভূতি মনকে তখন বিজড়িত

করিত না—করিত ইহার সাহচর্য্যের পরিবেশন ; কিন্তু ভূমিলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে এ-ও কৃপণ হইয়া অমৃতের পাত্রপুট টানিয়া লইয়াছে···সেকালের সঙ্গে একালের গ্রন্থি তখনই কাটিয়া গেছে···ইহার আন্দোলন আর ধ্বনির সঙ্গে একাকার হইবার পথ মানুষ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

যেদিন আকাল আসিল, সেদিন সে কেবল অতৃপ্ত ক্ষুধারই যন্ত্রণা দিল না—অন্তরস্থ আশ্রয় বস্তুকে সে কাড়িয়া লইল···যে ধারাবাহী চিন্তায় থাকিয়া থাকিয়া শিহরণ ফুটিত তাহা আগে আলোড়নে পল্বলের মত কর্দ্দমাক্ত, পরে শুকাইয়া কঠিন হইয়া গেল—তার ফাটল দিয়া এখন বাসুকীর বিষের জ্বালা ওঠে।

অভয়ের বয়স এই বত্রিশ—

এই বয়সেই সে পুরাতন জগতের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। কেন এমন ঘটিয়াছে এ প্রশ্নের শেষ উত্তর কোথাও বোধ করি আছে ; বালকে যেমন করিয়া ধূলা ছিটায়, একটা অস্বাভাবিক অস্পষ্টতা অদৃষ্ট তেম্‌নি করিয়া ছিটাইয়া রাখিয়াছেন ; তাহার উর্দ্ধে এ প্রশ্নের সমাধান হয় তো আছে···

পূর্ব্বপুরুষগণের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, স্বার্থ ছিল, অভিমান ছিল, অহঙ্কার ছিল···এই বিস্তীর্ণ পশ্চাৎপটের উপর তাঁরা লীলা করিয়া গেছেন···

কিন্তু আসল কথা এই যে, অভয় সংসারে কখন প্রবেশই করে নাই —দ্বারের নিকট হইতেই বিতাড়িত হইয়াছে···

তখনও বিপদ আসিত ; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন জীবনের পথে প্রাচীরের মত নয়—একটি অকিঞ্চিৎকর উপলস্পৃষ্ট বাধার মত···

আর এখন ?

অভয় চোখের উপর কাপড় বুলাইয়া কি মুছিল কে জানে, কিন্তু চোখে তার জল ছিল না।

পথে দেখা কালোশশীর সঙ্গে—

ধড়্ বড় পা ছোট কালোশশী তড়্বড়্ করিয়া চলিতেছিল; অভয়কে দেখিয়া সে দাঁড়াইল; ফুর্ত্তির সহিত বলিল,—চলেছি রামমোহনের কাছে; গেট্ করবো—তার দুটো বাঁশ চেয়ে রেখে' আসিগে।

অভয়ের চোখে বিস্ময় দেখিয়া কালোশশী না থামিয়াই বলিল,—বাবুরা তিন ভাই আস্‌ছেন যে।

অভয় বলিল,—জানি, শুনেছি।

—জান্‌বে বৈ কি, না জানার ত' কথা নয়। বলিতে বলিতে টপ্ করিয়া অভয়ের হাত ধরিয়া কালোশশী বলিল,—এস, এস · এ আমারও কাজ, তোমারও কাজ। বলিয়া অভয়কে সে গন্তব্য স্থানের দিকে টানিতে লাগিল।

অভয় বলিল,—যাচ্ছি, ছাড়।

কালোশশী তৎক্ষণাৎ তার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—এখন পেলে বাঁচি; রামমোহনটা যে কঞ্জুষ!

—তোমার নিজেরও ত' ঝাড় আছে।

কালোশশী চোখ মট্‌কাইয়া বলিল,—তুমিও যেমন! দাতার ডাব, বখিলের বাঁশ!...যা শত্রু পরে পরে ··

অভয় কালোশশীর শত্রু-বিদায়ের সঙ্গী হইল বটে, কিন্তু তেমন উৎসাহ তার দেখা গেল না ; বলিল,—দুটো টাকা দেবে ধার ?

—দেব ; দিন বেছে' যাত্রা আর লোক বেছে' উপকার আমি করিনে। তবে সে পরের কথা পরে হবে।

দু'চার পা যাইয়াই অভয় বলিল,—আমার যে এখনই চাই।

—এ-খ-ন-ই !·· চলো দিচ্ছি গিয়ে—এই বাঁশের কথাটা বলে' যাই।···তুমি না হয় ফেরো, বাড়ী হ'য়ে এস গে।

কালোশশী নিতান্ত পরিচিত লোক, অভয় ইঙ্গিতটা তাই এক নিমেষেই বুঝিয়া ফেলিল ; বলিল,—কিছু পাট দিতে পারি—আর কিছু নেই।

কালোশশী যেন হঠাৎ আহত হইয়া চম্‌কিয়া উঠিল ; পরম দুঃখের সঙ্গে বলিল,—কেবল তোমার নয়, কারো ঘরেই কিছু নেই, রইল না।·· এ বছর পাট কেনা আর টাকা জলে ফেলা সমান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।···আর কিন্‌বই বা কত ! কিনে রাখিই বা কোথায় !··· গাঁয়ের পনর আনা লোক কেবল পাটই আন্‌ছে মাথায় করে' করে'। তা' তুমি যাও, পাট পাটই সই।—বলিয়া দাক্ষিণ্যের একশেষ দেখাইয়া কালোশশী অভয়ের দিকে চাহিয়া ছাঁটা গোঁফ নাকের দিকে তুলিল ; তারপর সুমধুর একটু হাসিল।

এত সংক্ষেপে টাকা পাওয়া যাইবে অভয় তা' ভাবে নাই ; সে-ও কালোশশীর মুখের দিকে চাহিয়া সত্যিকার হাসিই একটু হাসিল—এবং নিজের হাসি দেখিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল···

বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষার একাগ্রতাই পশুর যথার্থ পরিচয়। কল্যকার .

অনাহার যন্ত্রণা অভয়রা ভুলিয়া যায় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তা' ভোলে না ; গত দিনটি পাথরের মত পশ্চাতের পাথারে তলাইয়া যায়—তাহাকে চোখের সম্মুখে উত্তোলিত করিয়া পুনরায় নিরীক্ষণ করিতে কেবল সাহস তাদের নাই···শুধু বর্ত্তমানই তাদের কাছে সজীব, সে-ই আসিয়া 'দাও' বলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায় ; যে-কোনো দক্ষিণা দিয়া তাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই ভার নামিয়া যায়।··স্বাভাবিক মানুষের মত দিকে দিকে সে তার সত্তার শিখা প্রধাবিত করিয়া দেয় নাই ; একটি মাত্র বিন্দুর উপর সকল রশ্মি নিপতিত হইয়া তাহাকেই অসাধারণ উত্তপ্ত আর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে ··আর সব শীতল ও অন্ধকার।···

মরিব না, বাঁচিব—এই সংস্কারের প্রভাব দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে বলিয়াই ওদের জীবনের গতি বাহির হইতে এমন সহজ আর সরল মনে হয়। · যাহা হইলে হইতে পারিত তাহার একটি প্রতিবিম্ব বাষ্পাচ্ছন্ন দর্পণের অভ্যন্তরস্থ ছায়ার মত অস্পষ্ট চোখে পড়ে।···ক্রিয়ারত সাবলীল যে বস্তুটিকে জীবন বলা হয় সে এমন কারাবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে—ইহা আশ্চর্য্য বটে ; তার আর সব অভিব্যক্তি নিদ্রিত ; কেবল প্রহরীর দৃষ্টির মত একটি চৈতন্য একই দিকে নিবদ্ধ হইয়া আছে—আজিকার দিনটি।

চিন্তায় অসাড়তা আনিয়া দিয়া প্রকৃতি তার উপকার করিয়াছে—উদ্বুদ্ধ মস্তিষ্ক জীবনের এই বিভীষিকা সহ্য করিতে পারিত না ; সম্বিৎ একই দিকে একাগ্র হইয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—সে আত্মহত্যা করে না।

অতি কষ্টে কালোশশীর বাঁশের যোগাড় হইয়াছে ; বাঁশ কাটিয়া ঝাড়েই রাখিয়া আসিয়াছে, দু'তিন জন লোককে ধরিয়া কঞ্চি ছাঁটিয়া বাঁশ ঝাড়ের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে।

অভয় যখন ত্রিশ সের পাট লইয়া কালোশশীর বাড়ীতে উঠিল, তখন বেলা দেড়টা আর কালোশশীর মেজাজ প্রফুল্ল হইয়া আছে।

কিন্তু পাট দেখিয়া সে মুখ সিট্‌কাইল ; বলিল, তোমার পাটের "কোয়ালিটি" খারাপ হে ! আঁশে "গ্লেজ" কই ! দালালে সঙ্গে সঙ্গে "রিজেক্ট" করে দেবে···সাতসিকের বেশী দিতে পারিনে।

কালোশশী ভাবিয়াছিল, খানিক টানা হেঁচড়া করিতে হইবে, কিন্তু অভয় সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—তাই দাও, সাতসিকেই দাও।

কালোশশী অবাক্ হইয়া গেল ; মনটা তার তির্‌তির্ করিতে লাগিল—দেড় টাকাতেই দিত বোধ হয়।···বলিল,—ডাঁহা লোকসান্ গেল, আনা চেরেক ত বটেই।—বলিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া থাকিয়া যেন লোকসান্‌টা সে সহ্য করিয়া লইল···তারপর, কেবল এই বৎসরের জন্যই পুরাতন টিন দিয়া নূতন নির্ম্মিত পাটের গুদামের দিকে চাহিয়া সরল হাস্যের সহিত কালোশশী বলিল,—যাক্ গে, আর ভাবি কেন !···

সাতসিকার চারসিকির দরুণ পূরা একটি টাকা আর তিনসিকির দরুণ কয়েকটি রেজকি দিয়া কালোশশী অভয়কে বিদায় করিল ; কিন্তু দেখিয়া লইলেই অভয়ের চোখে পড়িত, রেজকির একটি সিকি খারাপ।

## পরিচ্ছেদ ৩

বাবুরা আসিতেছেন।

বাড়ীর চারিদিকেই বড় বড় গাছ; তাদের হরিৎ—আলিঙ্গনের মাঝে অট্টালিকার শ্বেত-মূর্ত্তিটা কতকটা নির্লজ্জ দম্ভের মত দেখাইলেও ফুটিয়াছে বেশ।

এদিককার আয়োজন—অভয় জানিত না—কালোশশী বলিল, "কম্‌প্লিট", গেট্ প্রস্তত। বাবুদের "বেয়ারা" আর বসিবার চেয়ার আসিয়া পৌঁছিয়াছে···বেতের তিনখানি, তার উপর প্রায় শোয়া যায়—দুই পা দুইদিকে টান্ টান্ করিয়া মেলিয়া দিবার সুবন্দোবস্ত আছে; ছোট-খাট' তিন চারিটি মানুষকে তার আয়তনের ভিতর ডুবাইয়া রাখা যায়। কালোশশী বেতের বয়ন-কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়া গেল—টিপিয়া দেখিল, নোয়ান' কঠিন।

তারপর কাপড় লাগান চেয়ার, তাতেও অর্দ্ধেক শোয়া যায়—ইচ্ছা করিলে দোল খাওয়াও যায়···

অভয় বলিল,—বাবুরা কেবল শুতেই আস্‌ছেন!

—না, না। বলিয়া কালোশশী প্রতিবাদ করিয়া তৃতীয় প্রকারের চেয়ার দেখাইয়া দিল, যাহার উপর কেবল বসা যায়, পিঠ খাড়া বলিয়া শুইবার উপায় নাই। তারপর বলিল,—বাবুরা শুয়ে-শুয়ে যে মেহন্নৎটা করে, তোমার আমার ভূঁই চষার চেয়ে তা' আকাশপ্রমাণ বেশী।

—তা' হবে!

—তা-ই হয়েছে। মজুর আর বাবুতে তফাৎ ত' ঐখানেই। তুই সারা দিন খেটে ছ'-আনা পাবি—বড় জোর সাত আনা, বাবুরা মাথা খাটিয়ে হাকিমের সাম্‌নে একটি কথা বলে' দেবে, তার দাম দিতে হবে তোকে চারটি টাকা।

কালোশশীর মনে মহকুমার বড় উকিল নারায়ণবাবুর চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি কথা বলেন কম, দু'টি কি একটি; তাতেই কিন্তু মাম্‌লা ফয়সালা হইয়া যায়—সে কথার নড়্‌চড়্‌ নাই। কালোশশী দেখিয়াছে, নারায়ণবাবু ঐরকম একটা চেয়ারে প্রায়ই শুইয়া থাকেন। শায়িত মানুষের উপর অভয়ের মত কালোশশীর তাই অশ্রদ্ধা নাই। অভয়ের ছোট উকিলের শুইবার অবসর নাই।

কালোশশীও আগে চিনিত না এমন অনেক জিনিষের সঙ্গে বাবুদের "বেয়ারা" রামহরি তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিল—গ্যাস্‌ ষ্টোভ, ইক্‌মিক্‌ কুকার, হ্যাট্‌ র‍্যাক্‌, টয়লেট টেবিল, শেভিংষ্টিক্‌, সল্‌টেড্‌ বাটার···

এবং আরো অনেক—

কিন্তু কালোশশী তাহাদের একটি নামও দুই মুহূর্ত্তের বেশী মনে রাখিতে পারিল না।

তার অবাক মুখের দিকে চাহিয়া রামহরি পুনশ্চ বলিল,—বাবুদের টিফিনে খাবার পাঁউরুটী ইংরেজের দোকান থেকে রোজ ডাকে আস্‌বে।

কালোশশী এমন কি অভয়ও এ শুভ-সংবাদটা হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিল···পুলকে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কালোশশী অভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল···বাবুরা যেন তাহারই যত্নকৃত সম্পত্তি—সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি দেখ!

কালোশশী জিজ্ঞাসা করিল,—বাবুরা কি সস্ত্রীকই আস্‌বেন?

বাজে লোক হইলে এই প্রশ্নে দাঁতে জিব কাটিত, কিম্বা কৌতুক করিত; কিন্তু বাবুদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রামহরির চিত্তসংযম আসিয়াছে; শুধুই বলিল,—না, তাঁরা আসবেন না।

শুনিয়া গ্রামের অযোগ্যতা সম্বন্ধে অভয়েরও সন্দেহ রহিল না, এবং কালোশশীর সেদিনের তদ্বির ঐখানে শেষ হইল।

কালোশশী উপযাচক হইয়া কেন এত সমারোহ করিতেছে তার কারণ মানুষের তেমন চোখে পড়ে না। কেহ তাহাকে সে ভার দেয় নাই; নিজের স্কন্ধে অভ্যর্থনার দায়িত্ব লইয়া বাবুদের প্রীতিলাভ করিয়া বিশেষ লাভবান হইবে এ সম্ভাবনাও নাই—তবু সে মাতিয়াছে।

বাবুদের সমকক্ষ সে কোনো দিক দিয়াই নয়। বাবুরা ছাড়া-কাপড় যাহার উপর ফেলিয়া রাখেন, সে বস্তুটার নাম সে জানে না—কাঠের পালিশ দেখিয়াই তার চমক্ লাগিয়া গিয়াছিল। বাবুদের কুকুর যাহা খায় সে গুরুপাক দ্রব্য কালোশশীর পেটে গেলে চোঁয়া ঢেঁকুর উঠিবে বার ঘণ্টা দমসম্ ঠেকিবার পর।

তবু বাবুদের সঙ্গে তার ঐক্য আছে—একটা আলাহিদা স্থানে উভয় পক্ষের মনে মনে ধর্ম্ম-সমন্বয় ঘটিয়াছে; সেই একটি মাত্র দৈবজ্ঞ আবহাওয়ার মাঝে বাবুদের সঙ্গে কালোশশী একত্র অবস্থান করে।

দুই পক্ষই তুচ্ছ কারণে স্ফূর্ত্তি পায়। যে ভাগ্যহীনের দল জীবনের

এই স্ফূর্ত্তিটুকু জন্মের মত হারাইয়াছে, কালোশশী তাহাদের সঙ্গে বাস করিয়াও তাহাদের নয়—তার স্তর স্বতন্ত্র। মানুষ সবাই এক-একটি অস্তিত্বের বিন্দু; এই বিন্দুটি বিস্তৃতি লাভ করিতে মানসিক যে স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন তাহা কালোশশীর আছে—অভয়ের বিলুপ্ত হইয়া গেছে। কালোশশীর ভ্রমেও মনে হয় না যে, পৃথিবীর বুকের উপর তার সংস্থাপন বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রম,—পরন্তু সৃষ্টিশৃঙ্খলার একটি সম্যক্ দৃষ্টান্ত সে; নিজের জীবনের বাহিরের রূপ যাহা নিত্য নিয়মিতভাবে তার চোখের সম্মুখে লীলায়িত হইতেছে, কালোশশীর মনে হয়, সে তার আত্মার দিব্য-দ্যুতিরই রূপ···

তার ঐ দিব্য-বস্তুটি প্রাণ-প্রবাহের বিপরীত মুখে দাঁড়াইয়া, অভয়কে যেমন, তাহাকে তেমন করিয়া অধঃপতিত করে না।

কালোশশীর চোখের উপর একটা বীভৎস অভিনয় নিয়তই অনুষ্ঠিত হয় না—

পৃথিবীর গর্ভাবাস লুণ্ঠন করিয়া ছায়ামূর্ত্তি দলে দলে তীরের মত ছুটিয়া দিগন্তের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে; তাহাদের কাহারো হাতে অপহৃত স্বর্ণপিণ্ড, ছায়ামূর্ত্তির নাসিকাগ্রে শ্বেতচন্দনের তিলক-রেখার মত সোনার আভা পড়িয়াছে···

তাহাদের কাহারো হাতে রসপূর্ণ পাত্র,—"গেল গেল" রব তুলিয়া মানুষ যে আর্ত্তনাদ করিতেছে, তস্করেরা তাহাতে কর্ণপাত করিতেছে না।

দেখা যায়, দুঃসাহসী কে একজন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, ছুটিতে ছুটিতে দুই বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মাটি ছাড়িয়া সে লাফাইয়া উঠিল—মুখ হা, তাহার ভিতর গোঙানি···মাটিতে পৌঁছিয়া

দাঁড়াইয়া টলিতে-টলিতে সে পড়িল…খানিক কাঁপিয়া স্থির হইয়া রহিল—মরিয়াছে।

কালোশশীর এমন দুরদৃষ্ট নয় যে, এসব তার চোখে পড়িবে…তাই স্ফূর্ত্তি আছে, বাবুদের সঙ্গে মিল আছে।

বাবুদের বিশ্রাম আছে, কালোশশীরও আছে, অভয়ের নাই। দিনের পর দিন অভয় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, না হয় লক্ষ্যহীন হইয়া পথে পথে ঘাটে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়—কিন্তু কাজ নাই বলিয়া বিশ্রাম তার নাই। পলে পলে যাহার সঙ্গে দূরত্ব বাড়াইয়া এই অবসর মুহূর্ত্তগুলি—স্বতঃসিদ্ধ, সহজে অনুভূত হয় এমন আর কিছুই নয়, কেবল একটানা সূক্ষ্ম একটি মৃণাল-তন্তু প্রসব করিয়া চলিয়াছে, সেই বিলীয়মান বস্তুটির বিচ্ছেদ-বেদনায় তাহার তিলমাত্র বিশ্রাম নাই।

তন্তুটি কাটে না—

দেহ দুর্ব্বহ; দেহ যেন পাতলা একটা আবরণ—প্রাণান্তকর নিঃশব্দ আর্ত্তনাদের উপর বিছান' রহিয়াছে; এই বহনক্লেশ আর যাহাই দিক্ বিশ্রাম দেয় না।

কালোশশী তার বিশ্রামকে ভূষিত করিতে চায়—তা' নইলে তার চলে না।

# পরিচ্ছেদ ৪

বাবুরা বৈকালে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মাইল দুই রাস্তা "সাইকেলে" আসিতে হইয়াছে বলিয়া তাহাদের গায়ে কাটা-কাপড়ের পোষাক—আর তা এমন মজবুৎ করিয়া আঁটা যে, তাঁহাদের প্রকৃষ্ট উপকরণ সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

গাড়ীর সময় ধরিয়া কালোশশী গেটের সম্মুখেই ওৎ পাতিয়া ছিল··· তিন ভাইকে পর পর নমস্কার করিয়া সে সাইকেলত্রয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিল—

বাবুরা বুঝিলেন, এই ব্যক্তি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল—

কালোশশী দেখিল, তিন ভাইই সুপুরুষ, নধর গঠন, ধনীর দুলাল বটে।

প্রাণনাথ ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন; বাবুদের বহিঃপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া টেবিল-চেয়ারের বাহুল্য দেখিয়া তাঁর অসন্তোষ জন্মিতেছিল; তারপর বাবুদের দেখিয়া তাঁর হতশ্রদ্ধার অন্ত রহিল না··· এটা কি সুন্দরবন! বাঘের ডাক শুনিয়া গাছে উঠিতে হইবে নাকি যে কাছা-কোঁচা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ!···প্রাণনাথের আরো মনে হইল, ইহারা আহ্নিক করে না, গায়ত্রী ইহাদের মুখস্থ নাই—যদি থাকে তবে আমার এই টিকি—

কিন্তু পারত্রিক টিকিটি কঙ্কালী-দেবীর দুয়ারে বাঁধা দিবার পূর্ব্বেই প্রাণনাথ শিহরিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইলেন—

রামহরি বাক্স খুলিয়া বন্দুক বাহির করিতেছে।…যাহাদের সংস্পর্শ হইতে শত হস্ত ব্যবধানে থাকিতে হইবে বলিয়া সৎপরামর্শ দেওয়াই আছে, আগ্নেয়াস্ত্র তাহাদের তালিকাভুক্ত না হইলেও, জনৈক শিকারীর মুখে শোনা কথাটা প্রাণনাথের মনে ছিল—বন্দুকের গুলি নাকি সার্দ্ধ-দ্বিশত হস্ত দূরবর্ত্তী বস্তুকেও বিদ্ধ করিতে পারে।

কিন্তু রামহরি কেবল একটি ফাঁকা আওয়াজ করিল—ইটি ছোট-বাবুর সখ; পারিলে আওয়াজের সংখ্যা বাড়াইয়া বোধ হয় গেজেট করিয়া দিতেন। আগে হইতেই আদেশ দেওয়া ছিল; ছোট বাবু চেয়ারে বসিয়াই রামহরিকে ইঙ্গিত করিলেন—রামহরি করিল "ফায়ার।"

প্রাণনাথ আওয়াজটার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু চম্‌কিয়া উঠিতে হইল; এবং তারপরই তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

আগমনবার্ত্তা লৌহমুখে বিঘোষিত হইল, কিন্তু প্রাণনাথ ক্রূর ব্যক্তি—শব্দে বায়সকুল শঙ্কিত হইয়া কা কা রবে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইয়াছে দেখিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, উহারা দুর্জ্জনকে পরিহার করিতেছে; প্রাণ বাঁচাইবার জন্মগত বুদ্ধিবলে উহারা সর্ব্বদাই সতর্ক; উহারা তাই চিরজীবী, কিন্তু মানুষের সে সাধ্য নাই—আমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি একেবারে নিকটে কিঞ্চিৎ প্রণামীর আশায়, কেঁড়ে ধরিতে কালোশশী আসিয়াছে; ওদিকে, যে-শব্দে বায়সের ত্রাসের সীমা নাই সেই শব্দেই আকৃষ্ট আর কৌতুহলী হইয়া কয়েকটি বর্ব্বর বালক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মূলতঃ কথাটা ইহাই যে, বাবুদের 'ধরণ-ধারণে' তাঁর মনে হইতেছিল, প্রণামী প্রাপ্তির আশা পনর' আনা নাই, মাত্র এক আনা আছে—তাই তাঁর এই রাগ।

কালোশশী দ্বিচক্রের পশ্চাতে খানিক্ ছুটিয়া হাঁটিয়াই আসিতেছিল; বন্দুকের শব্দে আবার দৌড়াইয়া সে শীঘ্রই পৌঁছিয়া গেল। তখন গতির সম্মুখে প্রণামটা চলন সই গোছের হইয়াছিল—এবার বাবুদের অনন্যমনস্ক দৃষ্টির সম্মুখে কালোশশী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল।

বাবুরা স্মিত-মুখে প্রণাম গ্রহণ করিলেন; অসরল চিত্ত প্রাণনাথ ভাবিলেন, উভয় পক্ষই কপট।

বাবুরা টেবিলের ধারে চেয়ারে চেয়ারে বসিয়া গেলেন—

বড়বাবু রামহরিকে দিয়া বেঞ্চি আনাইয়া অভ্যাগতকে বসিতে বলিলেন; প্রাণনাথের রাগটা একটু কমিল অর্থাৎ আশা জন্মিল—এবং কালোশশী অল্প অল্প হাসিতে লাগিল—যেন না হাসিলেই বাবুরা তাহাকে গেঁয়ো স্বভাবের অপ্রতিভ লোক বলিয়া ভুল করিয়া বসিবেন।

বড়বাবু বলিলেন,—আপনাদের এখানে দেখে বড় খুশী হ'লাম।

কালোশশী প্রত্যুত্তরে কৈফিয়ৎ দিল; বলিল,—আজ হাটবার, সবাই হাটে গেছে; ফিরলেই সবাই এসে দর্শন করে যাবে; আপনারা আজই পদার্পণ করবেন তা' সবাই জানে।

মেজবাবু প্রশ্ন করিলেন,—কেমন করে' জান্‌লে সবাই?

—গেট্ প্রস্তুত যখন করি—

—আপনি করেছেন?

কালোশশী কিশোরী-সুলভ লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল; কোনো রকমে উত্তর একটা উচ্চারণ করিল,—না, না, ও কিছু নয়।

বড়বাবু আর মেজবাবু হাসিয়া কালোশশীকে আরো কুণ্ঠিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন···

কিন্তু ছোটবাবুর মেজাজ যেন কেমন! তিনি বলিলেন,—দলে দলে লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসুক এ আমরা চাইনে, আমরা অপার্থিব কিছু নই, হট্টগোল আমরা পছন্দ করিনে।

কথাগুলি রুক্ষ শুনাইল—

বড়বাবুর মনে পড়িয়া গেল, এখানে আসিবার পূর্ব্বে বন্ধু গণপতি তাঁদের বলিয়াছিলেন, মানুষগুলি উল্টাইয়া কোঁৎকা হইয়া না দাঁড়ায়, ইহা দেখিও। তিনি পিঠপিঠই হাসিয়া বলিলেন,—আমরা তাদের ভালবাসি তাই জানাতেই এসেছি···তাদের কাছে গিয়েই আমরা তা' জানিয়ে আস্‌ব···তারা এসে বিব্রত হবে এটা ঠিক নয়। তাই নয় কি?

প্রাণনাথ আর কালোশশী এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল,—আপনি কি আর ভুল বল্‌বেন!

প্রাণনাথকে স্বীকার করিতেই হইল যে, বড়বাবু মিষ্টভাষী ও মেজবাবু প্রভৃতি সকলেই হৃদয়বান্ সন্দেহ নাই।

মেজবাবু বলিলেন,—কাল সকাল বেলাই ঘুরে' আস্‌তে হবে একবার।

শুনিয়া কালোশশীর দেহে রোমাঞ্চ জাগিল; বলিয়া উঠিল,—যাবেন একবার; আমি আপনাদের দেখিয়ে শুনিয়ে আন্‌ব। কিন্তু বল্‌ব কি বাবু, পরিচয় করিয়ে দিতে লজ্জা বোধ হয়।

যেন গ্রামটি কালোশশীর পেটের সন্তান—সন্তানের অপরিচ্ছন্ন হতশ্রীতে তার লজ্জা আছে।

কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়াইয়া অভয় আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রাণনাথ পৈতা মাজিয়া আসিয়াছিলেন—সাবানের জলে ভিজা পৈতা শুকাইয়া চাদরের নীচে খর্‌খর্‌ করিতেছিল। "পৈতে কালো, বামুন ভালো, পৈতে সাদা, বামুন গাধা"—লোকে এককালে বলিত বটে, কিন্তু সেদিন আর নাই। কাহাকেও বুঝিতে না দিয়া গায়ের চাদরটা সাবধানে সরাইয়া যজ্ঞোপবীত গুচ্ছ বাবুদের চোখের সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবার আয়োজন প্রাণনাথ তলে তলে করিতেছিলেন, এমন সময় অভয়ের আগমনে তিনি ছাড়া আর চারিজনের চোখ অভয়ের দিকে পড়ায় ব্রাহ্মণের বিলম্বিত কর্ম্মটি সংক্ষেপে শেষ হইয়া গেল—

এবং ফলও ফলিল—

বড়বাবু উপবীত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; সসম্ভ্রমে বলিলেন,—আপনি ব্রাহ্মণ! প্রণাম হই। বয়োজ্যেষ্ঠ আপনি। বলিয়া হাত জুড়িয়া কপালে ঠেকাইলেন; বলিলেন,—আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলিনি'—ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে। আর আমাদের এমন বেবন্দোবস্ত যে তামাকের যোগাড় নেই।...ওরে?

রামহরি শুনিতেছিল; তামাকের কথা বলিয়া সাড়া দিল না।

প্রাণনাথ বলিলেন,—থাক্‌, ব্যস্ত হবেন না; আমি তামাকে তেমন অভ্যস্ত নই।

কিন্তু তাঁহারই পাশ হইতে ব্যস্ত হইয়া লাফাইয়া উঠিল কালোশশী; বলিল,—আমি তামাকের যোগাড় দেখ্‌ছি।...অতিশয় ভদ্রব্যক্তি ওঁরা; আমাদের মত তো নয়! একটু ত্রুটিতেই ওঁদের—

"মাথায় বজ্রাঘাত হয়" না বলিয়া কালোশশী বলিল,—মনে হয়,

বুঝি মানী ব্যক্তিকে অপমান করা হ'ল···তামাক আমি দেখ্‌ছি। বলিয়া সে চক্ষের পলকে কোন্ দিকে অন্তর্হিত হইল কে জানে।

ভুলের দরুণ আক্ষেপ ছিল—বড়বাবু তাই ঘোরতর সমাদর করিয়া অভয়কে বসিতে বলিলেন, এবং মাটিতে তাহাকে কিছুতেই বসিতে দিলেন না; উপরন্তু চেয়ার হইতে প্রায় অর্দ্ধেক উঠিয়া অভয়কে ভড়কাইয়া দিলেন। অভয় বেঞ্চিরই একধারে বসিল।

প্রাণনাথের দিকে চাহিয়া বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—ক'ঘর আছেন আপনারা?

প্রাণনাথের মনে হইল, যত বেশী বাস ব্রাহ্মণের তত কল্যাণ দেশের—এইরূপই বাবুর মনোভাব।···বলিলেন,—ছিলাম পাঁচঘর; বর্ত্তমানে টিকে আছি আমরাই একঘর; আমরাও আর বেশী দিন নেই।···আগে পৌরহিত্য করতাম, দিন ভালই চল্‌ত, পাওনা ছিল; এখন আমি ভিক্ষোপজীবী।—কঠিন আত্ম-পরিচয়টি ব্যক্ত করিয়া প্রাণনাথ ভাঙিয়া পড়িতে পড়িতে কায়ক্লেশে রহিয়া গেলেন।

আপশোষের কথাই, এবং বিবিধ আকারেই তাহা প্রকাশ করা যাইত; কিন্তু অপরে কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ছোটবাবু বলিয়া বসিলেন,—উঃ!···ব্রাহ্মণকে কিছু দেওয়া উচিত, বড়দা।

শুনিয়া প্রাণনাথের প্রাণ গোপনে নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্তু বড়বাবু হঠাৎ লাল হইয়া উঠিলেন···কথাটা বলা অবিবেচনার একশেষ হইয়াছে···ভিক্ষোপজীবী বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিলেই তাহাকে তখনই ভিক্ষা দিবার প্রস্তাব করা!···ব্রাহ্মণ হয়তো অপমানিত বোধ করিয়াছেন।

বড়বাবু বিজ্ঞ, তিনি উচ্চবাচ্য করিয়া ছোট ভাইকে লজ্জিত আর ব্রাহ্মণকে আরো অপমানিত করিলেন না—অতিশয় কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে প্রাণনাথের চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন···

প্রাণনাথ তাহা দেখিলেন; ভাবিলেন, এই যাইবার সময়···উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্য-মুখে বলিলেন,—যাই এখন, আহ্নিকের সময় হয়েছে। যতদিন থাক্‌বেন এখানে, আপনাদের যথাসাধ্য সেবা করব···সেবা মানে কেবল হাত পা টিপে' দে'য়া কি তামাক সাজা তা' ত' নয়; মানুষের সঙ্গও ত' আপনাদের চাই—যদিও কথা বল্‌তে জানিনে, আর কথা বলবার বিষয়েরও তেমন সম্বল নেই, তবু আস্‌ব।

বাবুরা তিনজনেই হাত তুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; কিন্তু কালোশশীর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বসিতে বলিতে কাহারও হুঁস হইল না।

···বড়বাবু অভয়কে বলিলেন,—তোমার নামটি কি?

—আমার নাম শ্রীঅভয়চরণ দাস, জাতিতে মাহিষ্য।

কালোশশী "ব্যস্ত-সমস্ত" হইয়া আর হুঁকো কল্‌কে এবং কল্‌কের উপর আগুন লইয়া রাস্তার মোড় ঘুরিতেই অভয়ের কথা তার কাণে গেল—বাবুরা অভয়ের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন···

কালোশশী রাস্তার মোড় হইতেই বলিল,—ভারি সৎলোক, বাবু। গ্রামের ইতর-ব্রাহ্মণ সবারই অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে, কেবল ও-ই খাঁটি আছে। বলিতে বলিতে হুঁকা হস্তে কালোশশী সভাস্থ হইল···

একাদিক্রমে ইতর ব্রাহ্মণ জনসাধারণের স্বভাব নষ্ট হইবার সংবাদে

বাবুরা ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেন ; কিন্তু কালোশশী ইঙ্গিতজ্ঞ লোক ; বলিল,— ধার নিয়ে না শোধা, দোকানীকে তার প্রাপ্য মূল্য না দেয়া, মিথ্যে কথা, প্রবঞ্চনা, এ সবও নষ্ট-স্বভাবের কাজই, বাবু !···তারপর চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল,—কই, ঠাকুর কই ?···বলিয়া পিছন দিকেও চাহিয়া দেখিল।

মেজবাবু বলিলেন,—ঠাকুর চলে' গেছেন। কি মনে করে' গেলেন কি জানি ! হয়তো আমাদের অসভ্যেই ঠাউরে গেলেন !

ঘোরতর প্রতিবাদ নিশ্চয় করা উচিৎ—মনে করিয়া হুঁকোটাকে কোথায় নামাইবে কালোশশী তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না এমন সময় যে সায়াহ্ণ-শান্তি পল্লীভবনে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, ভাঙ্গিয়া তাহা খান্ খান্ হইয়া গেল ··

সমুদ্রে যেমন জলস্তম্ভ ওঠে, একটা আর্ত্তকণ্ঠ সন্ধ্যার অন্ধকারের উপরে সহসা তেম্‌নি সচল হইয়া উঠিয়াছে। কালোশশী হুঁকা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—বাবুরা আঁৎকাইয়া উঠিলেন—অভয় মাথা নোয়াইল···

# পরিচ্ছেদ ৫

ক্রন্দনস্থর বহিতে লাগিল—

একটা অনৈসর্গিক গ্রামে উপনীত নারী-কণ্ঠের অনতিতনু দীর্ঘ সেই সুর সূক্ষ্ম ছন্দে আনত উন্নত হইয়া গড়াইয়া চলিল···মনে হইতে লাগিল, একই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে নহে—মাটি হইতে আকাশে উঠিবার ঊর্দ্ধ অধঃ দক্ষিণে বামে যেখানে যে রন্ধ্র পাইয়াছে সেই রন্ধ্র দিয়াই শব্দ উঠিতেছে—মুহুর্ম্মুহুঃ নিঃসৃত বহুশব্দ একটা নিরবচ্ছিন্ন নিনাদে স্ফীত হইতেছে।

কান্নার শব্দ মাঝে মাঝে কর্কশ শুনাইতেছে—কে যেন তাহাকে ভাঙ্গিয়া নামাইতে চায়···তবু তার বিরাম নাই।

বাবুরা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না—

রোদনরোল তাঁরা শোনেন নাই এমন নয়, কিন্তু এমন স্বতন্ত্র করিয়া কদাচ শোনেন নাই···সহস্র জাতীয় শব্দের মধ্যে সে-ও একটি শব্দ—ঐ শব্দ মাত্রই।

কিন্তু এখানে ঐ একটি মাত্র নক্ষত্র; দূরে কাহার কুটীরে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে—নয়নপল্লবে আগত নিদ্রার মত সুনিবিড় স্পন্দহীন অন্ধকার পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে···তাহারই মাঝে হঠাৎ এ কি!···কে যেন সূচীতীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করিয়া ভয়কুঞ্চিত অন্ধকারের প্রতি রোমকূপে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে···

হঠাৎ মনে হয়, এই রোদনধ্বনি নিষ্ফলে যাইবার নয়—কেহ না কেহ ঐ শব্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তার বেগসম্বরণের চেষ্টায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে···তার চক্ষুর পল্লবান্দোলন বন্ধ হইয়া আছে।

বিপন্নের ক্রন্দন এ নহে, সাহায্য করিতে কাহাকেও সে ডাকিতেছে না ··কোথায় গেল সে—এই তার প্রশ্ন কেবল !

পল্লী 'দ্রুমদলশোভিনীং' বটে, কিন্তু সেই দ্রুমদল যে পরলোকের ছায়ায় সুন্দরের ছদ্মবেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া হঠাৎ গা মেলিয়া দিয়া এমন নিরালম্ব নির্ম্মম রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে তাহা কে জানিত ! কপট বন্ধুর ভয়াবহ মূর্ত্তির সম্মুখি বাবুদের গায়ে কাঁটা দিল।

ইহা সত্যই যে, বাবুরা দেশের অবস্থাটা 'সরজমিনে' স্বচক্ষে দেখিতে আসেন নাই ; কোনো বিষয়ে পল্লীকে তাঁরা নাম ধরিয়া জানেনই না, এবং মানুষ কতস্থানে আহত হইতে পারে এ ধারণা তাঁহাদের নাই।

সে একখানি প্রশ্নপত্র অনাদি পুরুষের সম্মুখে ধরিয়া আছে—এই জনশ্রুতি তাঁহাদের শুধু কৌতূহলী করিয়াছে, অনুপ্রেরণা দেয় নাই। পল্লীর একটি ভাবমূর্ত্তি তাঁহাদের দৃষ্টিপথে বিচরণ করিত—তাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট মূর্ত্তিটির অবিকল ঐক্য হওয়ায় তাঁহাদের কল্পনা তৃপ্ত আর চিত্ত সরস হইয়া উঠিয়াছিল—পল্লীর আলিঙ্গন সুকোমল, তার শান্তিময়তা অনির্ব্বচনীয় বটে, কিন্তু আচম্‌কা নিটোল পল্লী ছিটাইয়া ছড়াইয়া পড়িল,···বাবুরা দমিয়া গেলেন।

এদিকে পৃথিবীতে যত ছিল হতাশা আর যত ছিল চক্ষুলজ্জা, বাবুদের সম্মুখে সযতনে উপবিষ্ট কালোশশীর মুখমণ্ডলে তা' সবই ঘনাইয়া আসিয়াছিল···

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে কাঁদ্‌ছে ?

কালোশশী ক্ষমাপ্রার্থীর মত সকরুণ সুরে বলিল,—আজ্ঞে, আব্দুলের মা বলে' একটি বিধবা মুসলমানী আছে ; সে-ই গণেশতলার হাটের দিনে ঠিক্ এই সময়ে আব্দুলের কবরের ওপর বসে' কাঁদে··

এই সূত্রে সুখ-দুঃখের দু'একটি কথা কেহ হয়তো কিছু বলিতেন, কিন্তু তাঁহাদের পরম হিতৈষী কালোশশী কাহাকেও সে অবসর দিল না ; বলিল,—আমরা প্রায় নিত্যিই শুনি এই কান্না, শুনে' শুনে' আমাদের সয়ে গেছে ; কিন্তু আপনারা যে এসেই শুন্‌বেন, আর আপনাদের মন খারাপ হয়ে যাবে এ বড়—

কালোশশীর কথায় মেজবাবুর কি কারণে আত্মগ্লানি জন্মিল, তাহা নিজেও জানেন না ; বলিলেন,—ইডিয়ট···

কালোশশী কৃতার্থ হইয়া গেল ; বলিল,—আজ্ঞে হঁ্যা।

ছোটবাবু ঠোঁট্ মুচড়াইয়া ঘরে উঠিয়া গেলেন ; তাঁর মনটা "খিঁচ্‌ড়াইয়া" গিয়াছিল ; তিনি "অর্গ্যান" খুলিয়া বসিলেন···

আর দু'জনেরও সেখানে আর মন টিকিল না—উঠিয়া পড়িলেন ; কালোশশীও উঠিয়া দাঁড়াইল ; অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল ; বলিয়া গেল—প্রায় রোজই হাট বসে দু'পাঁচ মাইলের মধ্যে ; শাক-শব্জী তরকারীর অসুবিধা তেমন নেই। আপনাদের লোক সঙ্গে যাবে—আমি কিনে কেটে দেব। আজ গণেশতলার হাট গেল, কাল মাধবপুরের হাট ; ছোট হাট, কিন্তু ডিমও পাওয়া যায়।

বড়বাবু বলিলেন,—আচ্ছা···আমরা এখন কাপড়-চোপড় ছাড়িগে।

বাবুরা ঘরে উঠিয়া গেলেন—

কালোশশী তাঁহাদের প্রণাম জানাইয়া বাড়ী গেল—

বসিয়া রহিল কেবল অভয়।

পুত্রের কবরের ধারে বসিয়া অকালমৃত্যুর শোকে জননী ক্রন্দন করিতেছে—তাহার ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া বাতাসে যেন মানুষের নিঃশ্বাস-বায়ু ধারণ করিবার স্থান নাই।

অভয়ের প্রথম পুত্রটি ছয় বছরের হইয়া মারা গিয়াছিল। জননীর এই ক্রন্দন তার নিজের ছেলের মৃত্যুদৃশ্যের উপর একটা একাগ্র অতি উজ্জ্বল আলোকপাত করিতে লাগিল। মাংসভুক্ কঙ্কাল শিশুর দেহের সমুদয় মাংস ধীরে ধীরে উদরসাৎ করিয়া চর্ম্মাবরণ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছিল—গণ্ডাস্থি অতি প্রকট, দাঁতের ধবল-আভা অতি প্রখর, চক্ষু অতি নির্জ্জীব।...শ্বাসের স্পন্দন যখন কণ্ঠ হইতে অবতরণ করিতেছে তখনও তাহার মনে হইয়াছিল, বাবা বলিয়া ডাকিবে বুঝি!

তাহার স্ত্রী তখন কাঁদিয়াছিল!

কিন্তু সে কান্না ভাল করিয়া তার কাণে যায় নাই...দূরে কোথায় কে যেন কাঁদিতেছে...শব্দ আকাশের দিকে খানিক্ উঠিয়াই নিঃশব্দে থিতাইয়া নামিতেছে...পৃথিবীর যেখানে সচল-অচল সজীব-নির্জ্জীব যে বস্তু আছে তাহারই অভ্যন্তরে নিঃশব্দে সে ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে, তারা ছাই হইয়া উড়িতেছে...

সব চলিতেছে, কেবল নির্ব্বাপিত চক্ষু দু'টি স্থির—এত জমাট স্থির যে, তার কূল-কিনারা মাপ-পরিমাপ ওজন-ইয়ত্তা নাই ..

স্ত্রীর দিকে চোখ ফিরাইতে তখন সাহস হয় নাই—বুঝি এমন কিছু চোখে পড়িবে যা সে চেনে না।

স্ত্রীর ক্রন্দন শুনিতে শুনিতে হঠাৎ তার মনে হইয়াছিল, ছেলে তোমার মরিয়াছে সত্যই ; কিন্তু এত মৃতের মধ্যে একটি মাত্র মৃত্যুর জন্য তুমি শোক করিতেছ কেন ? জান না, প্রতিদিনই পৃথিবীর শেষ দিন ! তার পা ঠাণ্ডা ; শিখর হইতে শরীর মুড়িয়া আসিতেছে !··· মুমূর্ষু পৃথিবীকে ঘিরিয়া উদ্বিগ্ন দেবতারা কণ্ঠাগত প্রাণে চুপ করিয়া আছে—তারা এত ভীত যে কাঁদিতে পারিতেছে না !···সূর্য্য প্রতিদিন তার শরীরে উত্তাপ দিতেছে, কিন্তু পৃথিবীর মৃত্যুর শৈত্যে হি হি কম্পন কমে না···এই বিরাট মৃত্যুর সম্মুখে তোমার ছেলে কতটুকু !

তারপর শ্মশানের দৃশ্য—

আগুনের সে কি শব্দ ! আহার্য্য পাইয়া আগুন নাচিয়া উঠিয়াছিল···

ছেলের অস্থি গ্রন্থি সন্ধিগুলি জমিয়া দেহ একখানা কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল—আগুনের আঁচে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া-চুরিয়া উঠিয়াছিল ; মনে হইয়াছিল, আগুনের আঁচ তার সহিতেছে না—পলাইতে চায় !···আরো মনে হইয়াছিল, নিশ্চয়ই দেবতারা ইহা লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহাদের কেহ চিতাগ্নির উপর হইতে শিশুকে তুলিয়া লইয়া যাইবেন—মুখে একটিমাত্র ফুৎকার দিয়া বাঁচাইয়া তাহাকে ফেরৎ দিবেন···

কে একজন বলিয়াছিল,—ওঠো, এক কলসী জল আন।···

জল আনিয়া অভয় দেখিয়াছিল, কালো অঙ্গারের ভিতর সাদা অস্থিখণ্ডগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে—

তখন মনে হইয়াছিল, দেবতা অক্ষম।

—কে ?

সে যে—কুশাসনখানা শ্মশানে পাতিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহারই উপর উপবেশন করিয়া শ্মশানচারী শম্ভু যেন প্রশ্ন করিতেছেন···

অভয় চম্‌কিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

মুখে কথা ফুটিল না—

—যে-ই হও, বাড়ী যাও। বলিয়া প্রশ্ন-কর্ত্তা দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

## পরিচ্ছেদ ৬

কাল গণেশতলার হাট গিয়াছে, আজ মাধবপুরের হাট।

অভয় আধ মণ পাট লইয়া হাটে গিয়াছিল—

স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ এইরূপ ছিল যে, সিকি-পাঁচেক যা' পাওয়া যাইবে তাহাতে দু' চার পয়সার মাছ, আট আনার চা'ল ; মেয়েটির পেটের অসুখ, তার জন্যে দু' পয়সার বার্লি, লঙ্কা আর তরকারী কিছু, আর নুন সওয়া সের ; বক্রী পয়সা সে ফেরৎ লইয়া আসিবে।

কিন্তু অভয় লইয়া আসিল, এক টাকা দিয়া একটি ইলিশ মাছ, টুক্‌টাক্ তরকারী, সামান্য চা'ল—যা'তে একবেলা কষ্টেসৃষ্টে হয়, আর লবণ আর লঙ্কা—পাঁচ সিকাই খরচ হইয়া গেছে—একটি আধ্‌লাও ফেরে নাই।

দাওয়ায় তরকারীর পুঁটুলী আর মাছ নামাইতেই অভয়ের স্ত্রী মাধবী জিজ্ঞাসা করিল,—মাছটা কত হ'ল ?

—এক টাকা।

—ফেরৎ পয়সা ?

—নাই।

মাধবী একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল ; তরকারী প্রভৃতি চালের সঙ্গে গামছায় বাঁধা ছিল—খুলিয়া দেখিয়া মাধবী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল···

মেয়ে ক্ষেণী আসিয়া মাছের কাছে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল ; বলিল,—মা, আমি মাছ দিয়ে বার্লি খাব।...মায়ের মুখে উত্তর না পাইয়া সে বাবাকে ডাকিয়া বলিল,—বাবা, আমি মাছ দিয়ে বার্লি খাব ; এবং বাপের মুখেও উত্তর না পাইয়া বলিল,—আমি খাবই।

ছেলে রসময়ও মাছ দেখিতে আসিয়াছিল ; সে বলিল,—তোর যে অসুখ—

ক্ষেণী ঝঙ্কার দিয়া বলিল,—তবে কি তুই একা খাবি ? হাবাতে' ছোঁড়া !

—বাবা খাবে, মা খাবে, আমি খাব। তুই--

ক্ষেণী ছুটিয়া যাইয়া দাদার হাত কামড়াইয়া ধরিল—একটা ছেঁড়া-ছিঁড়ি লাগিয়া গেল।

দাওয়ার মাটিতে মাছটা পড়িয়া আছে—তার সম্মুখেই অন্যান্য সওদা—চাল আর তরকারী, আর নিস্তব্ধ মাধবী...

ততক্ষণে অভয়ের ঘোর কাটিয়া গেছে ; মনে পড়িয়াছে, আজকার মত অন্যায় কাজ জীবনে সে আর করে নাই—ইহার বাড়া কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার কাজ মানুষের দ্বারা সম্ভবে না।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, এক টাকা দিয়া একটা ইলিশ মাছ অভয় ঠিক সজ্ঞানে কেনে নাই।

আধ মণ পাটের বোঝাটা মাথায় করিয়া হাটের পথে হাঁটিবার সময় অকারণেই হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল—মানুষের "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।"...অভয় তাদেরই দলের একজন যারা অতীত দিনটিকে অলীক মনে করে, আর আগামী দিনটির প্রতি সন্ধানী-দৃষ্টি

নাই···রাত্রে শুইবার সময় মনে হয়, একটা দিন কাটিল—এই অতি সুলভ সুখটিই তাহাদের দিনের অর্জ্জন।···অভয়ের স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, স্বার্থও আছে—জীবনকে ফুটাইবার আর খেলাইবার পটভূমি তাহার সম্মুখে সুবিস্তৃত—তবু সে কোথাও মূল প্রেরণ করিতে পারে নাই, মাটির উপর আল্‌গোছে দাঁড়াইয়া সে কোনো দিকেই চাহিয়া নাই···

মনেও পড়ে না, ইহার সুরু হবে—

দুর্নিবার দুঃখের প্রথম শায়কটির স্পর্শ কবে তার স্বাভাবিক চেতনায় বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া দিয়াছিল তাহা স্মরণ নাই। তখন হয়তো মনে হইয়াছিল, পটের ঈষৎ বদল ঘটিতেছে—এমন ঘটিয়া থাকে···সংগ্রামে মাতিয়া উঠিতে হইবে ভাবিয়া হয়তো তখন চূড়ান্ত করিয়া দেখিবার সহিবার উৎসাহে তার অজ্ঞাত স্নায়ুকেন্দ্রগুলি উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল···হয়তো সর্ব্বান্তঃকরণ পুনঃপুনঃ উৎক্ষিপ্ত হইয়া দুনিয়ার সঙ্গে একাকার হইয়া অপরিসীম চাঞ্চল্যে থরথর করিত।

তারপর একদিন বিস্মিত হইবার দিন আসিল—

অনশনের জহরব্রত সুরু হইল···দুঃখের প্রথম স্পর্শটি ক্রমাগত ঠেলিয়া ঠেলিয়া পথ করিয়া গভীর হইতে গভীরতর স্থান খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিল···কিন্তু তখনও মনের সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, মুক্ত বায়ুর শীতল স্পর্শ থাকিয়া থাকিয়া অনুভূত হইত, মন অচিন্ত্যনীয়ের অভিমুখে ছুটিত, পৃথিবীর ভাষা দুর্ব্বোধ্য কাকলীর মত কাণে আসিত ··

কিন্তু সে কতক্ষণ!

তারপর সুরু হইল সম্বিতের চতুরতা···মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত কিছুই পৌঁছায় না—তবু পাশ কাটাইতে পারে, প্রস্তুত না হইয়াই পারে—প্রস্তুত হইতে হইবে এই সতর্কতা মনে জাগিবার পূর্ব্বেই পারে। সঙ্কট পার হইয়াই সে বিস্মিত হইয়া যাইত, ধ্বংস এবার অপরিহার্য্য হইয়াছিল, কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইলাম!···দিনগুলি স্বতন্ত্রভাবে সাড়া দিয়া যায় না—একটা অনভিব্যক্ত মিছিলের মত কুয়াশার ভিতর দিয়া বহিয়া যায়—কোনো আকর্ষণেরই বশীভূত সে নয়; স্পষ্টতঃ কিছু দিয়া যায় না, স্পষ্টতঃ কিছু হরণ করে না।

সুবৃষ্টির দিনে হঠাৎ এক একটা মুহূর্ত্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়—সে-ও অনিশ্চিত কিন্তু পরিস্ফুট···জীবনের আদ্যন্ত মণ্ডিত করিয়া সে ছড়াইয়া পড়ে—সুখস্বপ্নে কাণের কাছে কার মৃদু মধুর আশ্বাস-বাণী গুঞ্জরিত হইতে থাকে—মন দোলায় শুইয়া দোল খায়—

কিন্তু সুদিনের সে অনতিদান ভোগ করে উত্তমর্ণ।

এখন সে কথাও মিথ্যা হইয়া গেছে···

সে নিজের কাছে বিদায় লইয়াছে; সংসারের রূপের, চাঞ্চল্যের, প্রগতির, বিশ্বাসের, প্রয়াসের বিরুদ্ধ দিকে তাহার যাত্রার শেষ আসে নাই···দেহ-আধারে প্রাণ আছে তাই চলিতে ফিরিতে হয়···চলিতে চলিতে বিভ্রান্ত হইয়া যায়—মনে হয়, দৈবাৎ বাঁচিয়া আছি!

যে দিনটি প্রথম তার অনাহারে কাটিয়াছিল, সেদিন রাত্রিও তার অনিদ্রায় কাটিয়াছিল—ক্ষুধার জ্বালায় নহে, ততোধিক কঠিন একটা অনুভূতিতে · সে কি অদ্ভুত উদ্বেগ—তার বর্ণনা নাই; সমস্ত স্নায়ুশিরা

টানিয়া ধরিয়া তার মেরুদণ্ডটিকে দুই হাতে দুমড়াইয়া কে যেন তাহাকে জ্যা-যুক্ত করিয়া ছাড়িয়া-ছাড়িয়া দিতেছিল···সেই উৎক্ষেপের শ্রমে একাসনে বসিয়াই ঘামে তার গা ভিজিয়া উঠিয়াছিল···

তখন তার চোখ যদি কেহ দেখিত তবে সে চম্‌কিয়া উঠিত—

দেহ নিশ্চেষ্ট ; কিন্তু দুঃসহ-ত্রাসে দৃষ্টি এখন পলায়নপর, যেন দেহটাকেও উপড়াইয়া সে সঙ্গে লইতে চায়···

সময়ে সময়ে কোলাহল করিয়া যে হরিনাম হয় তাহার আশ্রয়ে সে শান্তি পাইত···মনে হইত, গা গুটাইয়া কোথায় সে নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে—পৃথিবী তার সন্ধান জানে না, সে নিরিবিলি স্থানে আছে—কিন্তু এ আশা অর্থহীন—

পৃথিবীকে লেহন করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর করাতের মত কর্কশ জিহ্বার চিহ্ন অঙ্কিত খনিত করিয়া যে স্রোতটি তাহাকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে, সে অভয়কে ছুঁইয়া ফেলে···তাহাকে লেহন করে···

কিন্তু কাহার অভিশাপে এমন ঘটে কে জানে ; এই ক্ষত এমন গুরুতর নহে যে প্রাণ দেহ-বিযুক্ত হয়, এমন লঘু নহে যে সয় তবু তাহাকে বহন করিতেই হয়।

সে একা নয়—

কিন্তু তাহারা কেহ কাহারও নির্ভর নহে, সহায় নহে···কেবল পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মনে করে, কি ঘটে যদি ও মুখ খুলিয়া চীৎকার করে!

পাটের বোঝাটা মাথায় করিয়া হাটের দিকে যাইতে যাইতে অভয় দেখিতে পাইল, তাহাদের কেউ কেউ, এবং দু'চারজনকে দেখিয়াই তারমনে

হইল, তারা সবাই একটি করিয়া ইলিশ মাছ হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে···

দাম ?

কেহ বলিল, এক টাকা ; কেহ বলিল, আঠার আনা ; কেহ বলিল, তারও বেশী—পাঁচ সিকি।···অভয়ের শ্রান্ত মন ক্ষত-যাতনা ভুলিয়া প্রবাহিনীর স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল···অন্তরের আদি-মধ্যহীন যে ক্ষুধাকে অমনোযোগের অভ্যাসে সে ভুলিয়া গিয়াছিল, জনস্রোতের মাঝখানে তাহাকে হঠাৎ তার মনে পড়িল···কিন্তু হাহাকার করিয়া উঠিল না ; সমষ্টির সঙ্গে একাকার হইয়া এমন একটা প্রশান্ত প্রফুল্লতা আসিল যাহার স্বাদ জীবনে আর সে পায় নাই···মন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—মুক্তিস্নানের পর যেন সে নাসারন্ধ্র পূর্ণ করিয়া টানিয়া টানিয়া নিঃশ্বাস লইতে লাগিল।

মনের বিন্যাস নষ্ট হইল সত্য—কিন্তু সন্তান গর্ভচ্যুত হইয়া আসিলে জননীর উল্লাসের কাছে গর্ভের বিন্যাস-শৃঙ্খলা অতি তুচ্ছ।

কিন্তু মাধবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এখন তার মনে হইতে লাগিল, মানুষের দেখাদেখি সে অতীব কুকার্য্য করিয়াছে—হঠকারী দুষ্কৃতির সংস্পর্শে তার দুষ্কার্য্যে মতি জন্মিয়াছিল।

পাটের দাম এক টাকা চারি আনা মুঠার ভিতর লইয়া সে মাছের দোকানে ছুটিয়া আসিয়াছিল ; দেখিয়াছিল, গন্তব্য স্থানটি দুষ্প্রবেশ্য—তার চারিদিকে লোকের পর লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়া জমাট বাঁধিয়া আছে—মাছ একটি হাতে লইবার ব্যাকুলতায় তাহাদের গামছা-কাছার ঠিক-ঠিকানা নাই ; সবুর সহিবার যন্ত্রণায় কাহাকেও

পদদলিত করিতেছে কি না সে কাণ্ডজ্ঞানও তাহাদের লোপ পাইয়া গেছে।

অভয়ের আজন্মের অভ্যাসে বশীভূত মনের বাঁধন শিথিল হইয়া গেল···সে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কিন্তু এত ব্যাপারের মাধবী কি জানে! সে জানিবেই বা কেমন করিয়া! সে জানে না যে, মানুষের মন দিগ্বলয়ের দিকে চাহিয়া মহাকালের হস্তান্দোলন দেখিতে দেখিতে একবার তার ছেদের অবসরে সূর্য্যাস্তের আলোক-প্লাবন দেখিয়া মোহের আবেশে মৃত্যুকে বিস্মৃত হইতে পারে···সলিলাবর্ত্তের মাঝে ঘুরিতে ঘুরিতে তলাইয়া যাইবার সময় মন চাদের দিকে চাহিয়া সে পথের কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যাইতে পারে, যে-পথে মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে···রাক্ষসের মুষ্টির ভিতর হইতেও মানুষ প্রিয়জনের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিতে পারে···সব অভিমান আর অনুভূতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া মানুষ যখন কেবল পশুর ধৰ্ম্ম পালন করিয়া চলে, তখন লুপ্ত-চৈতন্য যদি একবার ফিরিয়া আসিতে পায় তবে দানবীয় অন্ধ-উল্লাসে একটি তরঙ্গে আসে!··· মাধবী কখনো ভাবিয়া দেখে নাই, দৈবের উপর অনন্ত নির্ভরতা মানুষকে কত নিঃস্পৃহ করিয়া তোলে···যে মরিলেই চুকিয়া যায়, দৈবক্রমে বাঁচিয়া সে একই লক্ষ্যের দিকে অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে পারে কি না—পলক-পাতের পর দৃষ্টি হঠাৎ বেঁকিয়া যাইতেও পারে! মাধবীর মনে হয় না, নিজেকে আর নিজস্বকে নির্ণিমেষে আগুলিয়া থাকিতে থাকিতে প্রহরায় দৈবাৎ শৈথিল্য আসিলে তাহা মার্জ্জনীয়···যে মানুষ দৈবের হাতে আর মানুষের হাতে পুনঃপুনঃ লাঞ্ছিত হইয়াও

অন্তরের জ্বালার ফেণভার রক্ত-লিপ্সায় মুক্ত করিয়া দেয় নাই সে বরণীয়…

আকুঞ্চিত হৃদপিণ্ডের যন্ত্রণায় যে ছট্‌ফট্ করিতেছিল, সে যদি হঠাৎ—বওয়া একটু হাওয়া পাইয়া তাহাতে অবগাহন করে সে ত ভালই।… জাগরণের ক্লান্তিতে একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়াছে বলিয়াই কি রক্ত মাংসের মানুষের পক্ষে দুর্ণিবারণীয় সেই অপরাধের জন্য মানুষকে প্রাণদণ্ড দিতে হইবে।

স্বামীকে মাধবী ধীর স্থির দেখে—

কিন্তু বুঝিতে পারে না, বসিয়া থাকিতে থাকিতে কেন সে হাত বাড়াইয়া ঘরের খুঁটি চাপিয়া ধরে।…নিশ্চয়ই মাধবী জানে না, নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে পঙ্কের উদ্গার—বুদ্বুদের মত স্বামীর মনের উপর অতিশয় স্বচ্ছ একটি ইচ্ছার উদ্ভব হয়—তাহাকে ইঙ্গিত করে—আঁধার—নিমজ্জিত দূরান্তবর্ত্তী তটের দিকে পুনঃপুনঃ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে…সংজ্ঞা অলস হইয়া আসে…রক্ত চম্‌চম্ করে…ভূতগ্রস্ত হইয়া ছুটিতে যাইয়াই সে কাঠের খুঁটি দু'হাতে চাপিয়া ধরে ··

মাধবী তা' জানে না—

মাছ লইয়া সে ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

পুরুষ বলবান এবং সমর্থ, এই কারণে তার কর্ত্তৃত্বের অনুগমনের সঙ্গে করুণা মিলিত করিয়া যাহারা স্বামীকে একান্ত বিশ্বাস করে, আর তার উপর বেপরোয়া নির্ভর করে, অভয়ের স্ত্রী মাধবী অভয়ের তেমন ধারা স্ত্রী নহে…স্বামী বলিয়া স্বামীর উপর তার ভক্তি আছে, কিন্তু রক্ষক হিসাবে আস্থা নাই, সব জানিয়াও নাই; প্রথম পুত্রটির মৃত্যুর পরই

তাহা নিরবশিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেছে···প্রতিপালক হিসাবে স্বামীর কতটা 'মুরদ' তাহা প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝিয়া স্বামীর দেহ ক্ষয় হইতেছে, তাহা মাধবীর চোখে পড়ে; কিন্তু বুঝিয়াও নিজের মনের যন্ত্রণার তাড়নায় নিরুপায়ের প্রতি তার ধৈর্য্য থাকে না।

মাধবী জানে, স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণে অক্ষমতার মার্জ্জনা স্ত্রী-পুত্রের কাছেও নাই—

রত্নাকর তাই ঠ্যাঙাইয়া মানুষ মারিত—হাত পা জড় করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে বসিয়া যায় নাই।

এদিকে হঠাৎ একটি কৈফিয়ৎ অভয়ের মিলিয়া গেল।

অভয় দেখে, ঘরে খাদ্য থাকিতেও ক্ষুধার সময় সন্তানের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মাধবীর মোটেই ব্যগ্রতা নাই···যতক্ষণ তারা ক্ষুধা সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, ততক্ষণই যেন তার সময়ের লাভ। স্ত্রীর সন্তানপালনের এই পদ্ধতিটাকে মনে মনে কোনোদিনই সে অনুমোদন করিতে পারে নাই···স্ত্রীকে নির্ম্মম মনে হইলেও সে কথা বলে নাই···তারপর দেখিতে দেখিতে সহিয়া যাইয়া ভাল মন্দ কিছুই মনে হইত না—যেন স্বভাবের গতিই এই।

ছেলেটি আর মেয়েটি মৎস্য ভক্ষণের উল্লাসে নাচিতেছে—সেই দিকে চাহিয়া অভয় তৃপ্তিভরে কহিল,—দেখ।

মাধবী চাহিয়াও দেখিল না—

অতিশয় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বলিল,—দেখেছি। তুমিও ওদের মত একজন নাকি! তুমি আমাকে ওই দেখাতে মাছ এনেছ সাড়ে ষোল আনা দিয়ে!

অভয় তবু হাসিল ; বলিল,—তা বৈ কি ! ওদের তুমি খেতে দিতে পার না তা' ত' আমি চোখেই দেখি—ক্ষিদের সময় ওরা তোমার পিছু পিছু কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

—ইলিশ মাছ খেলেই ওদের ক্ষিদের কান্না জন্মের মত থেমে থাক্‌বে—নয় ?···এর বদলে চারটি মুড়ির চাল আন্‌লে অনেকদিন ওদের কান্না শুন্‌তে হ'ত না।

অভয়ের মনে হইল, ইহার আর উত্তর নাই—মাধবী অতিশয় সত্য কথাই বলিয়াছে ··আপ্‌শোষে তার মন পুড়িতে লাগিল।

মাধবী বলিতে লাগিল,—ঐ ক'গাছা পাটের আঁশ নিয়ে ভেবেছ ওতেই তোমার চিরকাল যাবে ! পাগল কি গাছে ফলে !···ভগবান দেন না শুনি · যা' দিয়েছেন তারই এই গতি—বেশী দিলে আরো কত দেখ্‌তে হ'ত !

ভুলু দাস রাস্তার উপর হইতে হাঁকিল,—অভয় আছ ?

—আছি।

—কিছু দেবে ?

—না।

—বেশ। বলিয়া প্রত্যাখ্যানে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া ভুলু দাস চলিয়া গেল।

ভুলু দাস প্রত্যহই একবার করিয়া হাঁকিয়া যায়···প্রতিদিনই উত্তর পায়—"না। বলে—"বেশ।"

বড় ছেলেটির চিকিৎসার জন্য পঁচিশ টাকা কর্জ্জ দিয়া ভুলু দাস অভয়কে অসময়ে আসান্‌ দিয়াছিল···এখন সুদের টাকা "আসলে গণ্য"

হইতেছে…ভুলু দাসের টাকার জন্য বাড়াবাড়ি তাগিদ্ কিছু নাই… অভয়কে সময় দিয়া অভয়ের বাড়ীখানির চারিদিকে সে জাল ফেলিতেছে …জালের রশি টানিতে সুরু করিলেই আঠার' কাঠা মাটি সহ "মায় সাজসরঞ্জাম" ঘর দু'খানা অম্‌নি উঠিয়া আসিবে।

মাধবী বলিল,—দাও না বাড়ীখানা ওকেই লিখে—রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই গে' ; একদিন ত' দাঁড়াতেই হবে ; তুমি থাক্‌তে থাক্‌তে দাঁড়াতে পার্‌লে চোখে দেখেই যেতে পারতে।

শুনিয়া দুরন্ত-ক্রোধে অভয়ের মাথার রক্ত ঝম্‌ঝম্ করিতে লাগিল—মনে হইল,—মাধবী তার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী…যে প্রাণান্তকর সমস্যা লইয়া সে কালক্ষেপাত করে, তার বিশ্বাস ছিল, তার অর্দ্ধেক মাধবীর… কিন্তু তা' নয়, স্ত্রী-সম্পর্ক সে যেন স্পষ্টই অস্বীকার করিতেছে।

বলিল,—মানুষ বিয়ে করে এই জন্যে না কি ?

—কি জন্যে ?

—আমি যে খেতে দিতে পারিনে এইটে আমায় মনে করিয়ে দিতে !

—এই কথা ! সব লোকের কথা বল্‌ছ কেন তা হ'লে ? ঢাকাঢাকির ত' কোনো কথা নেই ; পার না এ ত' তুমিও জান, আমিও জানি, সবাই জানে…এরাও। বলিয়া মাধবী ছেলে-মেয়েকে দেখাইয়া দিল।

মায়ের অঙ্গুলি তাহাদের দিকে উঠিল দেখিয়া অবোধ মেয়েটি সহসা যাইয়া অভয়ের হাত ধরিল ; বলিল—বাবা, মাছ আমি খাবই ; দাদা—

কিন্তু কথা তার শেষ করা হইল না…

স্ত্রীর মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইতেই অভয়ের মনের ততখানি শূন্য আবহাওয়ায় ঝড় বহিতেছিল—তাহার বেগে সে কাঁপিতেছিল…নিজেই বোধ হয় মাটিতে

পড়িত, কিন্তু মেয়েরই কণ্ঠস্বরে পতন সম্বরণ করিয়া সে হঠাৎ দু' পা পিছাইয়া আসিল, আসিয়া মেয়েটির গালে প্রবল একটা চড় বসাইয়া দিল···

তাহারই দিকে উত্তোলিত কৃপাপ্রার্থী চক্ষু দু'টি নিমেষের জন্য নিমীলিত হইয়া গেল···রোগে ক্ষুধায় মেয়েটির দুর্ব্বল দেহ অবশ হইয়া পড়িতে পড়িতে একবার খাড়া হইবার চেষ্টা করিয়াই জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িল—

এবং পরক্ষণেই সেই আধা অন্ধকার অপরিসর উঠানে, ক্ষুধার রোগের চিন্তার যাবতীয় জড়তা মর্দ্দিত করিয়া যে কোলাহল উত্থিত হইল তার বর্ণনা নাই—

মাধবী চীৎকারের পর চীৎকার করিতে লাগিল,—মেরে ফেল্‌লে মেয়েটাকে···মেরে ফেল্‌লে, মেরে ফেল্‌লে···

ছেলেটি ভয় পাইয়া ততোধিক উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল,—খুকীকে মেরে ফেল্‌লে বাবা···ওগো তোমরা কে আছ দেখে যাও।

এই অবিশ্রান্ত আর্ত্ত চীৎকার চারিদিক্‌কার ঘন জঙ্গলে ধাক্কা খাইয়া সেই উঠানেই ফিরিয়া আসিতে লাগিল···

তাহাদের কাছাকাছি কাহারও ঘর-বাড়ী নাই, কেহ সাহায্যার্থে দৌড়িয়া আসিল না।

রাস্তা দিয়া কান্ত বিশ্বাস যাইতেছিল—

সে মিনিট খানেক রাস্তাতেই দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া শব্দগুলি শুনিল—তারপর সে কি ভাবিয়া চেনা পথে অন্ধকারেই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল।

অভয় তখন মেয়ের মাথায় জল দিতেছে।

# পরিচ্ছেদ ৭

বাবুরা কাল বৈকালে আসিয়াছেন ; তখন গ্রামের সবাই হাটে··· মাঝে একটি রাত্রি মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে।

খুব ভোরে উঠিয়া গ্রামের প্রান্তে যাইয়া সূর্য্যোদয় দেখিবার অভিলাষ তাঁহাদের ছিল ; পরস্পর তাঁরা শুনিয়াছিলেন যে, ঘোর রক্তবর্ণ একখানা থালার মত অতিশয় জাঁকাল' চেহারা লইয়া সূর্য্য প্রথমে উদিত হন—তখন তাঁহার দিকে চাওয়া যায়।

কিন্তু অভ্যাসবশতঃ উঠিতে দেরী হইয়া গেছে।

ছোটবাবু বলিলেন,—এ্যালার্ম টাইম্-পিস্‌টা আন্‌তে ভুল হ'য়ে গেছে।

মেজবাবু বলিলেন,—আমার ঘুম ঠিক সময়েই ভেঙেছিল ; কিন্তু উঠ্‌তে কেমন ভয় করতে লাগল' ; চারিদিক এমন কালো।

বাবুরা কালি আর কাজল ছাড়া ব্যাপক কালোর সঙ্গে পরিচিত নন্।

বড়বাবু বলিলেন,—শুনেছে বাবুরা এসেছেন, টাকাকড়ি নিশ্চয়ই কিছু সঙ্গে আছে···বাইরে বেরোওনি ভালই করেছ।

ছোটবাবু বলিলেন,—বন্দুক আমার শিয়রে হাতের কাছেই ছিল।

পল্লীগ্রামে চোরের উপদ্রব, তাহার প্রতিকার বন্দুক এবং বিলাতী দস্যুর তুলনায় এখানকার চোর ডাকাত কত অকিঞ্চিৎকর সেই সম্বন্ধে আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর চা-পান শেষ করিয়া বাবুরা উঠিবার

উদ্যোগ করিতেছেন,—এমন সময় বাহিরে কালোশশীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল···বলিতেছে,—দাঁড়াও এখানে তোমরা ; গোল ক'রো না, বাবুদের বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়।

শুনিয়া বড়বাবু বাহিরে আসিয়া দর্শন দিলেন ; কালোশশী দেখিল, তাঁহার মুখে ক্লান্তির কোনো নিদর্শন নাই। কালোশশীরা একে একে আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

বেলা তখন প্রায় সাতটা ; কিন্তু কালোশশী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—বাবু উঠেছেন এত সকালেই !···তারপর সগর্ব্বে বলিল,—দেখ্‌লি ত ?

অর্থাৎ প্রাতঃকালেই শয্যাত্যাগ করিবার অভ্যাস তোদেরই ছ'জনের একচেটিয়া নয় !

বড়বাবু বলিলেন,—উঠেছি অনেকক্ষণ। কি খবর তোমাদের ?

—এরা সব আপনাদের কাছে একটু দরবারে এসেছে !

—আমাদের কাছে কি দরবার ?

—আপনাদের কাছেই ত' দরবার ওরা করবে, বাবু। বলিয়া কালোশশী তার মুখভরা হাসি উপস্থিত ব্যক্তিগণের মুখের দিকে চাহিয়া ছড়াইয়া দিল।···তারপর বলিল,—নানা রকমের কষ্ট ওদের, বাবু। ওদের মুখেই দয়া করে' শুনুন্।

অগত্যা রাজি হইতে হইল। এতগুলি লোক কষ্টের কথা শুনাইতে আসিয়াছে—ইহাতে প্রীত হইবেন না এমন সৃষ্টিছাড়া মানুষ ওঁরা নন্ ·· তার উপর, কথার "ইতর-বিশেষ" অবগত না হইয়াই প্রত্যাখ্যান করিলে অহঙ্কারী নাম রটিয়া অপ্রিয় হইতে হইবে—তাহাও, আর যেখানেই হোক্, এখানে শোভন হইবে না।

অতএব চেয়ার চৌকি দক্ষিণের রোয়াকে নামিল।

তিন বাবু আর সাত মক্কেল দরবারে বসিয়া গেলেন।

বসিয়া বড়বাবু বলিলেন,—কি তোমাদের কথা বলো।

কালোশশী বলিল,—বলো। নির্ভয়ে বলো।

কিন্তু লোকগুলি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল…কে আগে সুরু করিবে তাহাও যেন সমস্যা!

মেজবাবু দেখিলেন, বৃথা কালব্যয় হইতেছে।…তাঁহার মনে হইল, ইহাদের প্রধান দোষ দীর্ঘসূত্রতা—দীর্ঘসূত্রতা ইহাদের মজ্জাগত। হাঁটায়-বসায়, চোখের চাউনিতে পর্য্যন্ত ইহাদের এমন মন্থরতা আর "যাই-যাচ্ছি ওড়াখোড়া" শৈথিল্যের ভাব, যেন কেউ নেহাৎ টানে বলিয়াই নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এরা চলে; দুরবস্থার মূল আর কোথাও নয়, এইখানেই।

মেজবাবুর অভক্তি জন্মিয়া গেল।

বড়বাবু বলিলেন,—কার কি বল্‌বার আছে বলো…আমাদের সময় কম।

—সে ত' ঠিক কথাই, আপনাদের সময়ের দাম কত! বলিয়া সাউকুড় কালোশশী লোকগুলিকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল, 'তোদের এখানে এনে আমিই যে আহাম্মুক বনে গেলাম বাবুদের কাছে! বোকারা সব—ভেবেছিস্ কি বাবুরা তোদের তাঁবেদার! তোদের মুখের কথা শোন্‌বার জন্যে হাঁ ক'রে বসে' থাক্‌বেন!…তোরা থাক্—আমি চল্‌লাম বাবুদের অনুমতি নিয়ে। বলিয়া কালোশশী হাঁটুতে হাত চাপিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই, জয়নাবের দায়টা ছিল বড়.

অবলম্বন সরিয়া যায় দেখিয়া, সে-ই মরিয়া হইয়া তার ক্লেশের কাহিনী সুরু করিয়া দিল···

সংক্ষেপে তাহা এইরূপ—

তার দুর্দ্দান্ত এবং অধার্ম্মিক শ্যালকেরা তার "বিবাহের" স্ত্রীকে নিজেদের বাড়ীতে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—কিছুতেই ছাড়িয়া দিতেছে না ; আনিতে গেলে মারপিটের ভয় দেখাইতেছে।··· এইরূপ আজ প্রায় ছয় মাস চলিয়া আসিতেছে···অধুনা কষ্ট অধিকতর হইয়াছে এই কারণে যে, পিত্রালয়ে যাওয়ার সময় জয়নাব-পত্নী অন্তঃস্বত্বা ছিল ; পনর দিন হইল সৌভাগ্যবতী একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছে, কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের "চাক্ষুষ" হইতে দুর্বৃত্ত শ্যালকেরা দেয় নাই। আজও···

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন এমন করে ?

জয়নাব বলিল,—হুজুর ব'লব কি ! আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পাঁচ আনা দু' গণ্ডা দু' কড়া, দু' ক্রান্তি অংশের মালিক আমার স্ত্রী। সেইটে ওরা লিখিয়ে রেজেষ্ট্রী করে নেবে এই ওদের মৎলব। সে আস্‌তে চায় কিন্তু তার ভাইয়েরা দলীল না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে আট্‌কে রাখবে।

কালোশশী বলিল,—আস্পর্দ্ধা কত !

বড়বাবু মেজবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তা' কি হয় ? স্বামী আর ছেলে থাকৃতে ভাইকে সম্পত্তি লিখে দিলে সে দলীল কেমন করে' 'ভ্যালিড্' হবে !

আইনজ্ঞ এঁরা সবাই—

মেজবাবু বলিলেন,—আইন কি তা' জানিনে। তবে সামাজিক ব্যবস্থা এই যে, স্ত্রী স্বামীর কাছেই থাক্‌বে ; স্ত্রীর সম্পত্তি স্বামীই ভোগ করবে। আইন যদি কাণ্ডজ্ঞানের নির্ঘণ্ট হয় তবে তাতেও তাই আছে বলে' আমার বিশ্বাস।—বলিয়া মেজবাবু খুব সপ্রতিভ ভাবে চেয়ারের হাতলের উপর অঙ্গুলির আঘাত করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন, ক্রান্তির পরও ক্ষুদ্র কিছু আছে কি না।

আইন তাহারই অনুকুলে শুনিয়া জয়নাব কাঁদ' কাঁদ' হইয়া উঠিল ; বলিল,—আপ্‌নারা থাক্‌তে আইন-আদালত আমরা চিনিনে, হুজুর। খরচান্ত কাজ ; ও'দিকে যেন কেউ না যায়।···যদি হুকুম করেন ত' তাদের একবার ডেকে আনি হুজুরের কাছে।

কালোশশীর মন দুলিতে লাগিল—

কোন দিকে টানিয়া কথা বলিলে বিচক্ষণতা বেশী প্রকাশ পাইবে ?···বাবুরা কি সালিশী করিতে আসিয়াছেন!···অথবা, যাও, শীঘ্রই ডাকিয়া আন ; এমন সুবিধা আর পাওয়া যাইবে না।···মনে মনে তর্ক করিতে করিতেই সময় ফুরাইয়া গেল···ছোটবাবু বলিলেন,—কি দরকারে ? দাঙ্গা বাধাতে ? ··তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিক্ বলে' তাদের ওপর আমরা জুলুম করতে পারব না। আজকাল সবাই এক আইন ছাড়া আর সবারই পক্ষে স্বাধীন। সে যদি আমাদের কথা গ্রাহ্য না করে! কি জোর আছে তার ওপর আমাদের ?

প্রশ্ন শুনিয়া কালোশশী শিহরিয়া উঠিল—

অপরিচ্ছন্ন দাঁত দু'টি বাহির করিয়া জিব কাটিয়া বলিল,—ছি, ছি, অমন কথা বল্‌বেন না—কারো ঘাড়ে···

একাধিক মস্তক নাই ইহা সত্য, কিন্তু মেজবাবু হাত তুলিয়া নির্য্যাতিত কালোশশীর বাক্যোচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিলেন।

কালোশশী ঢোক গিলিল, জয়নাব মুখ নামাইয়া রহিল।

কালোশশী বলিল,—মুকুন্দ, তোমার মাম্‌লাটাও ফয়সালা করে' নাও এই বেলা—তোমার আসামী ত' হাজির।

যেন জয়নাব চূড়ান্ত বিচার পাইয়া নির্ব্বিবাদ হইয়া গেছে।

মুকুন্দের সুদের নালিশ—

পাওনাদার খতের নালিশ করিয়াছিল—ডিক্রীও পাইয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাবুরা যদি অনুগ্রহ করিয়া এই ব্যক্তিকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া সুদ কিঞ্চিৎ ত্যাগ করাইতে পারেন, তবে গরীবের গরু ক'টি বজায় থাকে···

শুনিয়া পাওনাদার অল্প একটু হাসিল—

এবং বড়বাবু তাহার মাম্‌লাও সঙ্গে সঙ্গে "ফয়সালা" করিয়া দিলেন; বলিলেন,—আদালতের ডিক্রীর ওপর হাকিমী করবার অধিকার আমাদের নেই; আমাদের কথা শুনতে ও বাধ্য নয়।

মেজবাবু বলিলেন,—শুন্‌তে আমরা বল্‌তেই পারিনে—তার এক কারণ, উভয় পক্ষের বিবরণে আদালতে যে বৃত্তান্ত প্রকাশ হ'য়ে হাকিম রায় দিয়েছিলেন, সে বৃত্তান্ত আমরা অনবগত।···তোমাদের উভয় পক্ষেরই সাক্ষী ছিল ত' আদালতে?

—ছিল হুজুর।

—তবে?

হার জিত্ যারই হোক্, বাবুদের ন্যায়বুদ্ধির সংস্কৃত রূপ দেখিয়া

পল্লীগ্রামের লোক কয়েকটি বিস্মিত হইয়া গেল···অত ঘূরাইয়া নাক সেকেলে লোক দেখাইত না। 'কেন করবিনে', 'কেন হবে না', 'কেন দিবিনে'—ইত্যাদি দু'টি একটি হুঙ্কারেই তখন মহা মহা বিবাদ ব্যাপার ঠাণ্ডা হইয়া যাইত—তার দ্বিরুক্তি ছিল না। "আমি বল্‌ছি"—বলিয়াই পূর্ব্বেকার কর্ত্তা-ব্যক্তিরা আপামরের মধ্যে নিজেকে একাধিপতি অটল আর অমেয় করিয়া রাখিতেন। এই মিহি কর্ত্তব্যবোধ আর ঔচিত্য নিষ্ঠায় উদারতা আর গুণপণা যতই থাক্ সেকেলে দরাজ স্থূল-শক্তির তুলনায় ইহা কাপুরুষতারই নামান্তর; ইহাতে দরদ নাই, নির্ম্মুক্তি প্রসন্নতা নেই।

অপ্রস্তুতে পড়িয়া মুকুন্দ প্রভৃতি দরখাস্তকারিগণ কালোশশীর মুখের দিকে বিমূঢ়-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—কালোশশীই এই কাণ্ডের গুরু, একরকম ভজাইয়াই লোকগুলিকে হাজিরা সে দেওয়াইয়াছে।

কিন্তু কালোশশী তাহাদের মুখের দিকে চাহিল না। বাবুদের বিচারবিমুখ দেখিয়া উহারা ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেও কালোশশীর খুসী হইতে বাধে নাই—বাবুরা সাবেকী আর মামুলী পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া "কাজের খতম" করেন নাই—পল্লী-আসরে একটি চমক্‌প্রদ সুচারু বৈশিষ্ট্য দিয়াছেন···অথচ কথাগুলি যা' বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।···বটেই ত'! সরকারী মহামান্য আদালত বারমাস খোলা থাকে, কিঞ্চিৎ 'ফিস্' দিলেই অবারিত প্রবেশ-পত্র পাওয়া যাইবে···ওঁরা এ সবের কি জানেন!

বলিল,—তখনই বলেছিলাম, বাবুদের তোরা বিরক্ত করিস্‌নে; ওঁদের কাছে নিয়ে আয় আইনের তর্ক, বাখ্যা ক'রে জলের মত

বুঝিয়ে দেবেন।···আদালতের জ্ঞাত মারফতে যা শেষ করেছ তার ওপর হাত দেয় গোঁয়ারে—ওঁরা তা পারেন না।···বুঝ্‌লি ত? এখন যা'।

ওরা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, কিন্তু সরল সত্যটি কালোশশীকে কেহ বলিয়া যাইতে পারিল না,—তুমিই ত আমাদের আনিয়াছ!···তুমিই মিথ্যাবাদী।

ছোটবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন···

এমন অপরিমেয় অখণ্ডতা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বস্তু; এমন আনন্দে উদ্বেলিত করিয়া তোলে, যেন অনন্ত আত্মবিলয় ব্যতীত ইহার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিবার অন্য উপায় নাই···এই আকাশই যেন মানুষকে নাচিতে শিখাইয়াছে···ইহার দিকে চাহিয়া মানুষের পা ছন্দধৃত ভঙ্গিমায় উত্থিত পতিত হইয়া, কখন নখাগ্রে ভূমি স্পর্শ করিয়া টিপিয়া টিপিয়া সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে আলোড়িত হইয়াছিল; কখন বাহুযুগল সম্মুখে প্রসারিত করিয়া, কখন ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিত করিয়া, কখন দেহ দুলাইয়া, কখন দেহ নমিত করিয়া, সঙ্কুচিত করিয়া, ঊর্দ্ধায়িত করিয়া, লতায়িত করিয়া সে প্রথম নৃত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল···

তারপর গতি··সূর্য্যালোকে সে পথ দেখিয়াছিল—

পাখীর গানের সঙ্গে সে এমন গান গাহিয়াছিল, যার ভাষা নাই—যার ভাষার প্রয়োজন নাই।

অত্যাশ্চর্য্য নীল-ব্যাপ্তিকে খণ্ডিত করিয়া আর অলঙ্কৃত করিয়া লঘু হস্তের স্পর্শের মত খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে···

দেখিয়া পৃথিবীকে এমন শান্ত নির্ব্বিকার নিরাপদ মনে হয়,

যেন পৃথিবী কেবল এখনই ভূমিষ্ঠ হইল—এখনও তার চোখ ফোটে নাই।

অবাধ চমৎকার রৌদ্র দিক্‌সীমা পর্য্যন্ত মৃত্তিকার অঙ্গ পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে…

প্রথম রৌদ্রচ্ছটা দেখিয়া মানুষ কি করিয়াছিল! ইহার ঔজ্জ্বল্য তাহাকে বিস্মিত করিয়াছিল নিশ্চয়…নিষ্কম্প নিষ্পলক দীপ্তি তাহাকে ভীত করিয়াছিল না কৌতূহলী করিয়াছিল বেশী!

ছায়ায় দাঁড়াইয়া সে ভয়ে ভয়ে পা বাড়াইয়া এক পায় দুই পায় ছায়ার সীমায় যাইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তারপর অতি সন্তর্পণে রৌদ্রের ভিতর পা দিয়াই গরম লাগিয়া তাড়াতাড়ি পা টানিয়া লইয়াছিল…একবার লাফাইয়া রৌদ্রে পড়িয়া তখনি ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—এম্‌নি করিয়া কতক্ষণ সে রৌদ্রে ছায়ায় খেলা করিয়াছিল ঠিক কি!…অবশেষে দেখা গেল, রৌদ্র ক্ষতি কিছু করে না…ক্রমে একেবারে নির্ভয় হইয়া রৌদ্রে যাইয়া সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কোথা' হইতে এই অপূর্ব্ব বস্তু আসিতেছে!…যে এমন জিনিষ এই শীতল মৃত্তিকায় পাঠাইয়াছে, তাহাকে স্তব কর…সূর্য্যই মানুষের আদি-দেবতা হওয়া উচিত। আকাশের নিম্নে আর রৌদ্রের অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া তাহার কণ্ঠ দিয়া যে অব্যক্ত আনন্দনাদ নির্গত হইয়াছিল, তাহাই বোধ হয় ওম্‌।

এদিকে কয়েকটি এক আউন্স ওজনের পাখী কি কাজে মাতিয়া উঠিয়াছে তাহার উদ্দেশ নাই।…একটি বৃক্ষ-বীথিকার দু'ধার পল্লবে অন্ধকার—মাঝখানে বিহসিত আলোর অচঞ্চল ধারা…

পাখীগুলি তাহার মাঝে সরিয়া আসিয়াছে···একই পরিবারের কয়েকটি, তীরবেগে তারা ছুটাছুটি করিতেছে—যেন কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা তখনই তাদের জানা চাই-ই···একই সময়ে সর্ব্বস্থানে উপস্থিত থাকিতে না পারিলে দেখাটা বাদ পড়িয়া যাইবে, সোজা পথে তাই এক নিমিষের বেশী সময় ছুটিবার উপায় নাই···এই ডাইনে, এই বাঁয়ে, এই উপরে, এই নীচুতে ; মুহুর্ম্মুহুঃ দেখা দিয়া তারা পাশেই কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে···

একটি প্রজাপতি উড়িতেছে—

ছোটবাবু বিস্মিত হইলেন, অত সূক্ষ্ম পক্ষ দু'টি অত আন্দোলন সহ্য করিতেছে কেমন করিয়া! মানুষের সুখ—বিচরণের লালসা আছে, আর সৌন্দর্য্যের সন্ধানী. সে—কিন্তু আজও সে প্রজাপতিটির রূপের অনুকরণ আর অন্তরের অনুসরণ করিতে পারে নাই···

বোঁ করিয়া একটা বোল্‌তা কানের পাশ দিয়া উড়িয়া গেল—ছোটবাবু চম্‌কিয়া উঠিলেন ; বলিলেন—তারপর ?

মেজবাবু হাসিয়া বলিলেন,—কিসের তারপর! তারা সবাই চলে গেছে।

কিন্তু তারা চলিয়া গেলেও অপরে আসিতেছিল—তখনই একটা বুক-ফাটা চীৎকার শোনা গেল,—দোহাই বাবুদের···গরীবের মা-বাপ···

বাবুরা উদ্‌গ্রীব হইলেন—

চীৎকার শব্দ অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তী হইয়া বাবুদের সম্মুখস্থ হইয়া দাঁড়াইল···

বাবুরা দেখিলেন, লোকটি প্রৌঢ় এবং তাহার হাতে ধারাল একখানা কাটারি রহিয়াছে।

কি খবর?

প্রশ্নের উত্তরে লোকটি যাহা বলিল তাহা এই ঃ সে তাহার গাভীটি খুঁজিয়া পাইতেছিল না, কা'ল দ্বিপ্রহর হইতে। আজ প্রাতঃকালে দক্ষদমন সিক্দারের কথায় তাহার বিস্মৃত কথা মনে পড়িয়া যায় এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, দক্ষদমন সিকদারের দেওয়া সংবাদ সত্য—গরু খোঁয়াড়ে আছে। তাহার নাম মদন, কিন্তু গগন নামে এই গ্রামে একটি লোক বাস করে যাহার কাজ কেবল পরের গরু তাড়াইয়া লইয়া খোঁয়াড়ে ঢুকাইয়া দেওয়া এবং পয়সা লওয়া···ইহাকে দিনে ডাকাতি বলিতেই হইবে। গগনের অত্যাচার অসহ্য হইয়াছে; বাবুরা ইহার 'বিহিত' না করিলে সে কাটারির সাহায্যে নিজেই অন্যায়ের প্রতিকার যতদুর পারে করিবে···বাবুরা যেন তখন তাহাকে দুষ্ট লোক মনে করিয়া অপরাধী করিয়া না বসেন।···

অভিযোগ নিবেদন করিয়া এবং কাটারি রাখিয়া মদন বাবুদের শ্রীচরণে ভক্তিভরে প্রণত হইল, কিন্তু তাহার নাক দিয়া যে ফোঁস ফোঁস শব্দটা নির্গত হইতেছিল তাহা ক্ষান্ত হইল না।

মেজবাবু প্রশ্ন করিলেন,—গরুটি ছাড়িয়ে আন্‌তে তোমার কত লেগেছে?

—পাঁচ আনা, বাবু।

—পাঁচ আনার জন্যে তুমি মানুষকে কাটারি দেখাচ্ছ! তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত···

ছোটবাবু বলিলেন,—তুমি ছেলেমানুষী করছ।·· মেজাজ ঠাণ্ডা করে' আমাদের সাম্‌নে তোমার দুঃখ জানালে একটা উপায় বলে' দিতে হয়তো পারতাম ; কিন্তু তুমি আস্ফালন করে' আমাদের মন বেঁকিয়ে দিয়েছ। বুঝ্‌লে ?

মদন বুঝিতে পারে নাই যে, আর কেউ না হোক্‌, ছোটবাবু তাহার ক্ষতিতে নয়, তাঁহাদের সম্মুখে অসংযত আচরণে দুঃখিত হইয়া গেছেন···

মদন কথা কহিল না, কেমন অপ্রতিভ হইয়া রহিল—

বড়বাবু বলিলেন,—তোমার কথা সত্যি তা' কেমন করে' জান্‌ব ?

বড়বাবুর মনে হইতেছিল, সমগ্র ব্যাপারটা খুব প্রকাণ্ড হইয়া উঠিতে পারে···

মদন বলিলও তাই—

—আমি গাঁয়ের লোক সবাইকে ডেকে এনে' প্রমাণ দিচ্ছি, বাবু, যে ও-র স্বভাবই ঐ।

ছোটবাবু শিহরিয়া উঠলেন ; বলিলেন,—থাক্‌। আমরা বিচার করবার কে ! সে ভার আমাদের নিতে যাওয়া অনাবশ্যক।···যদি আর কোনো কথা না থাকে তবে যেতে' পারো।

মদন কাটারিখানা তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

এবং সেই পথেই আর পরক্ষণেই যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল, দেখা গেল, তাহার হাতে একটি চারা-গাছ রহিয়াছে—চারাটির মূল একটি সিক্ত মৃত্তিকা-স্তূপে প্রোথিত···

ছোটবাবু দেখিলেন, পাতাগুলি তার চমৎকার সতেজ।

লোকটি মৃত্তিকাস্তূপসহ চারা গাছটিকে রোয়াকের উপর খাড়া

করিয়া বসাইয়া দিল ; তারপর মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—বিলিতি আমড়ার চারা, বাবু ; আপনাদের দেব বলে' এনেছি। বলিয়া লোকটি নিজের দানের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল··· বলিল,—এমন আমড়া এ-গাছে ফল্‌বে যা', বল্‌তে নেই, আম ফেলে খাবেন। · কোথায় বসাব !

বাবুদের হাসি পাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ হাসিলেন না।

মেজবাবু মিষ্টকণ্ঠে বলিলেন,—তোমার বাড়ীতে বসাও গিয়ে, আমরা আজ আছি কাল নেই—

—ছি ছি, তা' কি হয় ! দেব বলে' এনেছি—ফিরিয়ে নিয়ে যাব না। বলিয়া সে দু'বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল,—তা' নিয়ে যাব না। আর, আজ আছি কাল নেই—ও-কথা বল্‌তে নেই ; আপনারা চিরদিন বজায় থাকুন ধনে-পুত্রে। · এই গাছে আমড়া ফল্‌বে, আপনাদের ছেলেমেয়েরা ঝোল-অম্বল খাবে আর বলবে, গিরি কেওটের গাছের আমড়ার ঝোল-অম্বল খাচ্ছি। ··বসিয়ে দিয়ে যাই, বাবু !—বলিয়া গিরি কেওট অতিশয় সকরুণ-দৃষ্টিতে বাবুদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন এই অপার সঙ্কটে ত্রাণ তার চাই-ই।

এই উপঢৌকনের সামগ্রী অপূর্ব্ব, তাহা লওয়াইবার জিদও অপূর্ব্ব, লোকটির আশাও অপূর্ব্ব—

এবং প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার হতাশাও অপূর্ব্ব হইবে মনে করিয়া ভীত হইয়া বড়বাবু বলিলেন,—তা' বেশ, তোমার ইচ্ছে হয়েছে যখন তখন রুয়ে দিয়ে যাও, যেখানে তোমার খুশী।

অনুমতি লাভ করিয়া গিরি কেওটের দেহ যেন আনন্দে দীর্ঘতর হইয়া উঠিল···

আরও ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া সে স্মৃতি-চিহ্ন রোপণ করিতে চলিয়া গেল—

বাবুরা হাসিতে লাগিলেন।

তিনজনেই দেখিলেন,—একটি শীর্ণদেহা কুক্কুরী ছুটিয়া আসিল—পশ্চাতে তার পাঁচটি স্তন্যপিপাসু সন্তান···কুক্কুরী অদূরে পা মেলিয়া দিয়া মাথা খাড়া করিয়া শুইল; বাচ্চাগুলি স্তনে মুখ লাগাইবার শশব্যস্ত ব্যাকুলতায় কাহার ঘাড়ে কে চাপিল তাহার ঠিক রহিল না··· সকলে মুখ না লাগাইতেই জননী উঠিয়া পড়িল—বাচ্চাগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল···

ছোটবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন—তাঁর মনে হইল, পরিত্যক্ত সন্তানগুলির পেট ভরা দূরে থাক্, গলাই ভেজে নাই। তিনি উঠিয়া রোয়াকের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন···

দূরে কোন্ বাদ্যব্যবসায়ীর গৃহে সানাইয়ের শব্দ হইল—শিক্ষানবিশের ফুৎকারে যন্ত্র দিয়া যে আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল তাহা মধুর কিছুতেই নয়···সানাইয়ের আশে-পাশে ঢোলেও কয়েকবার কাঠি পড়িল···

একটি বায়সী তার সন্তানের গলার ভিতর খাদ্য প্রবেশ করাইয়া দিতেছে···বাচ্চার এতবড় হাঁ, ভিতরটা লাল; তার ক্ষুধার যেন ইয়ত্তা নেই, মায়ের মুখ হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিতে তার এম্‌নি কলরব আর অস্থিরতা···

সানাইয়ের শব্দ বন্ধ হইয়া গেল···

কোথায় একটা কোলাহল সুরু হইয়াছিল—সানাইয়ের শব্দে চাপা পড়িয়া বোধ হয় তাহা কর্ণে প্রবেশ করে নাই; সানাই থামিতেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল···

স্বীয় পল্লী অন্তর স্পর্শ করিতেছে না, ক্ষুণ্ণ এবং আন্‌মনা হইয়া তিনজনেই ইহা ভাবিতেছিলেন, এবং সম্ভবতঃ একটা আলোচনার সৃষ্টি হইত, কিন্তু ঐ কোলাহল শুনিয়া তিনজনেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন···

ছোটবাবু যাইয়া রোয়াকের প্রান্তে দাঁড়াইলেন; সেখান হইতে কালোশশী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গেট্ দেখা যায়, কিন্তু বেণুবন ও আম্র-বাগিচার অন্তরালে কি ঘটিতেছে তাহা জানিবার উপায় নাই।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—গোলমাল কিসের?

মেজবাবু বলিলেন,—আমরা কেউই তা' জানিনে।···এমন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সব দেখ্‌তে হচ্ছে যে, আমি ত অবাক্ হ'য়ে গেছি।···বলিতে বলিতেই ছোটবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া আপন আসনে বসিয়া পড়িলেন···

—কি? বলিয়া মেজবাবু উৎকণ্ঠিত হইলেন।

ছোটবাবু বলিলেন,—অনেকগুলি লোক এদিকে আস্‌ছে।

—আসুক। বলিয়া মেজবাবু, তাহাদের আসিবার সম্ভাবনা যেদিক্ হইতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন···

বড়বাবু বলিলেন,—কিছুই ভাব্‌তে দিচ্ছে না।

তৎক্ষণাৎ যে ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল, বাবুরা দেখিলেন, সম্পূর্ণ

নগ্ন হইয়া যাইতে তার অল্পই বাকি আছে—বস্ত্র বলিয়া যে আবরণ সে ধারণ করিয়াছে তাহা এমনি ক্ষুদ্র ; কিন্তু তার কাঁধের লাঠিখানা খুবই বড় আর বলিষ্ঠ···

লোকটি খুব উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল—

কিন্তু বুঝা গেল, সুস্থির হইয়া সে কথা বলিতে চায়···

ছোটবাবু শঙ্কায় আশায় মিলিত একটা ভাব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন ; কিন্তু আর কেহ দেখা দিল না—

খানিক্ নিঃশব্দ থাকিয়া এবং সম্ভবতঃ ক্রন্দন দমন করিয়া সে বড়বাবুর সৌম্য-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিল,—এ গাঁয়ে আর থাকা গেল না, বাবু···গাছের ফল লুটে নিতে লেগেছে···আপনাদের দুয়োরে এসে দাঁড়ালাম···আমি বিচার চাই আপনাদের কাছে ··

কাংস্য এবং মৃৎপাত্রের মত পরস্পরের এই অবিরাম ঠোকাঠুকি এবং একজনের গাত্রে অনিবার্য্য ছিদ্র হওয়ার কাহিনী ভাল লাগিবার কথা নয় ; তবু বড়বাবু মিষ্টস্বরে বলিলেন,—কি হয়েছে তোমার বলো।

কিন্তু শুনিয়া উঁহাদের মনে হইল, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই হয় নাই···

লোকটি বলিল, তাহার সুপারি গাছে উঠিয়া প্রতিবেশী মেহেরের ছেলে আদু রাশীকৃত সুপারি ছিঁড়িয়া লইয়া গেছে, ৮।১০টি খুব হইবে। অপক্ক সুপারি যাহা সে গাছের তলদেশে ফেলিয়া গেছে, তাহার নমুনা সে হাতে করিয়াই আনিয়াছিল—বাবুদের সে তাহা দেখাইল।··· ইহা ছোটখাট' চুরি নহে ; দিবাভাগে ঘটিয়াছে বলিয়া ইহা দুঃসাহসিক ডাকাতি; এবং পিতামাতার প্ররোচনায় ঘটিয়াছে এরূপ সন্দেহ করিবার

কারণ আছে বলিয়া ইহাকে প্রশ্রয় দিবার ফল আরো ভয়ঙ্কর·· চোরের বাপের মায়ের কথায় যে বিশ্বাস করে সে অখাদ্য খায়; তাহারা যত পারে অস্বীকার করুক, বাবুরা যেন তাহা ঘুণাক্ষরেও প্রত্যয় না করেন।···তাহারা সবাই মিলিয়া একই সুরে তাহাকে গালি দিয়াছে, এবং তাহাদের মনে যে পাপ আছে তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, বাবুদের সম্মুখীন হইতে তাহাদের সাহস হয় নাই।···এখন, বাবুরা কি সুবিচার করেন তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।···

অতিশয় বাহুল্যদোষযুক্ত ভাষায় এবং অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে এই অভিযোগ এবং কাঁচা সুপারিটি বাবুদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সে রোয়াকের উপর উঠিয়া পা ঝুলাইয়া বসিল···

ছোটবাবু বলিলেন,—তোমার সঙ্গে যারা আস্‌ছিল তারা কই?

লোকটি হঠাৎ নামিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—তারা ফিরে গেছে, বাবু।···সাক্ষী আমার আছে, বাবু; বলেন ত' ডাকি।

—না, দরকার নেই।···আমরা বলি, তুমি আদুকে ক্ষমা করো; সামান্য ৮।১০টি সুপারি ত'!···বলিয়াই মেজবাবু দেখিলেন, লোকটির চোখে বিস্ময়ের যেন অন্ত নাই···

এবং বাবুত্রয়কে বিস্মিত করিয়া সে বলিল,—আপনারা বুঝ্‌লেন না আমার কথাটা···ভগবান নারাজ · যারা ভাল করতে পারে তাদের মনও তিনি কেড়ে নিয়েছেন; আমাদের জন্যে রাখেন নাই।···বলিয়া লোকটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল; বাবুরা প্রশ্ন করিবার সময়ই পাইলেন না।

বড়বাবু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—কি অপরাধ কর্‌লাম!

—তা' জানিনে, বড়্দা ; শেষ করো। বলিয়া মেজবাবু উঠিলেন।

রামহরিকে ডাক পড়িল, চেয়ার চৌকি ঘরে উঠিল ; বাবুদের বিশ্রামের অবসর মিলিল।

পল্লীকে কমনীয় নম্র শান্তিনিকেতন কল্পনা করিয়া ইঁহারা তাহাকে বিচার নয়, প্রচার নয়, প্রশংসা নয়, সম্ভোগ নয়, কেবল একখানি অত্যাশ্চর্য্য ছাঁচের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতেন ; কিন্তু তাহার যথার্থ স্বরূপ দেখিয়া বিব্রত কি বিস্মিত হইলেন না—হতাশ হইয়া গেলেন··· তাঁহাদের অনিন্দ্য ভাবমূর্ত্তির বিকৃতি যেন তাঁহাদের আত্মকৃত পাপের পরিণামের মত সুপ্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিল।

মাত্র গুটিকতক সুপারির জন্য অত বড় আলোড়ন উপস্থিত করা শুধু আধ্যাত্মিকতার অভাবেরই লক্ষণ নহে ; অত্যন্ত নির্লজ্জ স্বার্থো-পাসনার পরিচয়···

মেজবাবুর মনে হইল, পল্লীর শান্তি পল্লীরই শান্তিপ্রিয়তার রচনা নহে, আবহাওয়ার গুণ নহে, তার নিঃসঙ্গ নিমজ্জমান অন্তরের বেদনা নহে—কেবল কুঁড়ের যা' দোষ—সেই ঝিমুনি।···আরো তাঁর কষ্ট হইতে লাগিল ইহাই উপলব্ধি করিয়া যে, পল্লীর নিজস্ব মাদকতা নাই—কেবল কঠিন আত্মপরায়ণতা মানুষগুলির প্রত্যেককে যেমন করিয়া আপন আপন গণ্ডীর ভিতর স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, যে ইহার সংশ্রবে আসিবে তাহাকেই তেমনি চারিদিক্‌কার অজ্ঞাত স্থান হইতে বিশীর্ণ আঙ্গুল বাড়াইয়া যেন ফাঁদে জড়াইয়া গ্রাস করিয়া ফেলিতে চায় !

তিনি দেখিতে ভুলিয়া গেলেন যে, শ্রুতি-উৎপীড়ক যত গণ্ডগোল

এ-পর্য্যন্ত তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন, তার প্রত্যেকটিই অর্থসমস্যা-মূলক—এবং তাহা অতি গভীর।...যাহার সুপারি চুরি গিয়াছে, ঐ সুপারি ক'টিই ছিল তার অন্ততঃ এক সপ্তাহের নুন-তেলের সংস্থানের উপায়...সুপারি পয়সায় পাঁচটি।...গগন প্রামাণিক বনাম মদনচন্দ্র মাম্‌লাতেও তা-ই—ঐ পেটের দায়...মদন নির্দ্দোষী গরুকে লইয়া খোঁয়াড়ে দিয়া কিঞ্চিৎ নুন-তেলের পয়সা করিয়াছে—এবং মদনের পাঁচ আনা অপব্যয়িত না হইলে ঐ পাঁচ আনায় কত কি যে হইতে পারিত তাহার ইয়ত্তাই নাই...ফর্দ্দ করিয়া লটকানা দোকানে দিলে ঐ পাঁচ আনায় পঁচিশটি ছোট-বড় মোড়ক পাওয়া যাইত।...স্ত্রীর সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া যাহাকে শ্যালকেরা পথে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছে সে ভাবিতেছে, স্ত্রীর ঐ পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশ তাহার আয়ত্তে থাকিলে তার অভাব কমিবে...শ্যালকেরা ভাবিতেছে, ভগিনীর ঐ অংশটুকু যো-সো করিয়া লিখিয়া লইতে পারিলেই কিছু আয় বাড়িবে।

আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকু এককণা তাহাদের কাহারো ভাণ্ডারে নাই—মনের ভুলেও নাই—যাহার যতটুকু যাক্ ততটুকুই অমূল্য ও অত্যাজ্য...মনের তন্‌তিব ভাঙ্গিয়া তাহাতেই তার পাগল পাগল ঠেকে। · তাহাদের অবিরাম মনে হয়, যেন কাহারো অনুপস্থিতির সুযোগে আসিয়া বসিয়াছে—সে আসিলেই উঠিয়া যাইতে হইবে; তাই তাহাদের ধৈর্য্য এত কম।

ছোটবাবু ভাবিলেন, প্রকৃতির প্রসন্নতা, ক্রীড়াশীলতা ও সাত্ত্বিকতা ইহাদের চোখের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াও ইহাদের মনের গুহায় প্রবেশ করিতে পারে নাই; তাই এরা এত সঙ্কীর্ণ!

বড়বাবু ভাবিলেন, দৈববিড়ম্বনায় কোনো কাজই যেন মনের মত সুষ্ঠু হইতেছে না…লোকগুলি তাঁদের অপরিপক্ক মনে করিতেছে কি অকালপক্ক মনে করিতেছে কে জানে!…জ্যাঠামশায় কি বিপদেই ফেলিয়াছেন!…লোকটার হাতের কাটারিখানা কি ভয়ঙ্কর! · লোকগুলির দৃষ্টির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল—কখন একনিবিষ্ট, কখন বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, কখন প্রবীণোচিত গম্ভীর কিন্তু নিঃস্পৃহ ; কিন্তু চোখের তারা কোণের দিকে আনিয়া যখন পাশের দিকে চায়, তখন ভয় করে—অত্যন্ত ধূর্ত্ত চাহনি, দুঃসাহসী আর নির্ম্মমও বটে…মানুষের যে কোনো হানি যে কোনো সময়ে যে কোনো কারণে করিতে পারে!—

কিন্তু ইঁহাদের এবং ইঁহাদের তুল্য কলিকাতাবাসী বাবুদের সম্বন্ধে কালোশশীর গোপন মতামত অবগত হইলে ইঁহারা এবং তাঁহারা সমান অবাক্ হইয়া যাইবেন। কালোশশী একবার কলিকাতায় যাইয়া অনেকের বাসস্থান এবং কর্ম্মস্থল দেখিয়া আসিয়াছিল—

প্রথমেই তার মনে হইয়াছিল, ইহাদের দু'বেলা ক্ষুধা হয় না নিশ্চয়ই ; "পায়রাখুপীর" মধ্যে আবদ্ধ জীবগুলি মাথার হাড় না ভাঙিয়াও এদিক্ ওদিক্ কেমন করিয়া বেড়ায় তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও পারিপাট্য প্রশংসনীয় বটে—দিব্যি ফিট্-ফাট্।…মানুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও, গরুটি কি বাছুরটি যে একবার লেজ তুলিয়া দৌড়াইয়া আসিবে সে স্থান লোকালয়ের কাছে কোথাও নাই ; গরু বাছুরেরই কষ্ট বেশী—শীতে ঠির্‌ঠির্ করিয়া কাঁপে ; একটু রৌদ্র পায় না।…লোকের ঐশ্বর্য্য খুব—তিরিশ হাজার মটর গাড়ী দিন-রাত ছুটাছুটি করিতেছে—গণিয়া কেহ দেখিতে পারে না ; গাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে নম্বর থাকে। বাবুর

নীচেয় গদি, তাঁর কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত গদির উপর বসান' থাকে···বাবু মটরের ভিতর বসিয়া থাকেন, আর সংবাদ-পত্র পাঠ করেন; যাতায়াতের ঐ সময়টাই তাঁর পাঠের অবসর।···বাড়ীর পর বাড়ী গায়ে গায়ে লাগা—সম্মুখে বাড়ী, পশ্চাতে বাড়ী—মানুষ যে চোখ্ মেলিবে তাহার একটু ফাঁক্ নাই··

দেখিবার জিনিষ?—ঢের আছে। কিন্তু আমরা তার কি বুঝি!··· তবে হ্যাঁ, ব্যবসার স্থান বটে—জাহাজ, নৌকা, রেল, ষ্টীমার, মটর, গো-যান যাহা চাও, পয়সা দিলেই প্রস্তুত।···তিন দিন তিন রাত্রি ছিলাম—দিনে ক্ষুধা পায় নাই, রাত্রে নিদ্রা হয় নাই···গ্রামে আসিয়া শরীরে বাতাস লাগাইয়া তবে বাঁচি।···

বাবুরা?···এ-বাবুতে সে-বাবুতে কলিকাতায় তফাৎ কিছু নাই—ভিড়ের ভিতরে সবাই সমান নগণ্য আর বোধ হয় অপদার্থ···তবে যাহার কাছে যাহার খাতির তাহার কাছেই সে বড়।

পল্লীগ্রামে আসিয়া ইঁহারা কেহ কেহ একটা অদ্ভুত ভাব ধারণ করেন—মনে ভয়, মুখে বাচালতা, যার নাম দিতে চান্ সপ্রতিভতা; তাঁরা মনে করেন, নির্ব্বোধেরা তাঁহাদের অস্বাচ্ছন্দ্যের অস্থিরতা ধরিতে পারিতেছে না—তাঁহাদের চতুরতা, বুদ্ধি, আর যে কোনো ব্যাপার চক্ষের পলকে বুঝিয়া ফেলিবার অসাধারণ ক্ষমতার কাছে ইহারা একেবারে বেচারা!

কিন্তু ধরা পড়িয়া যান্ কথায়—

এক বাবু কালোশশীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তোমরা জল খাও কোথাকার?

কালোশশী এই বাহুল্য প্রশ্নের উত্তরে মনে মনে কৌতুকী হইয়া প্রকাশ্যে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিয়াছিল,—আজ্ঞে, নদীর জল।

—এই মরা নদীর নোংরা জল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে হে? আমাদের কলের জল খাওয়া অভ্যাস, বুঝ্‌লে?

কালোশশীর মনে হইল, বাবু একটি আর্ত্তনাদ চাপিয়া গেলেন; সে ঘাড় আরো নোয়াইয়া বলিয়াছিল,—আজ্ঞে, তা বই কি।·· আপনারা যে এদিকে আসেন সে ত' প্রাণ একেবারে হাতে করে!···আপনাদের দয়া অগাধ তাই ত' আসেন।···বলিয়া কালোশশী পরম দয়ালুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া গিয়াছিল।· বাবুরা যেন পল্লীবাসীর সৌভাগ্য-শালী জ্ঞাতি-পুরুষ—অধঃপতিত আর বহুদূরবর্ত্তী এ-পুরুষের সঙ্গে মাত্র একটা গোত্রের সম্বন্ধ আছে; তাহা যিনি চক্ষুলজ্জায় লুকাইয়া রাখিতে চান্ না, তিনি দরিদ্রের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বাবুটি বলিয়াছিলেন,—হ্যাঁ, আস্‌ব বই কি! পল্লী ছাড়া কি আমাদের গত্যন্তর আছে?···ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমরা খুব ভাবছি; আর চাষের কথাও আমাদের সভায় মাঝে মাঝে আলোচিত হয়—বিশেষজ্ঞ আছেন। খবরের কাগজে দেখে' থাক্‌বে।

কালোশশী সময় বুঝিয়া কোট পরিয়া দেখা দিলেও খবরের কাগজে কি থাকে তাহা কস্মিন্‌কালেও জানে না; কিন্তু অম্লানবদনে বলিয়াছিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ; আপনার নাম আমি বহুবার খবরের কাগজে দেখেছি।

শুনিয়া বাবুটি কালোশশীকে নিজের পাশে বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন—

বলিয়াছিলেন,—কিন্তু মুস্কিল কি জানো!···সব পল্লীরই এক সমস্যা

নয়—কারো জলাভাব, কারো রোগ, কারো দারিদ্র্য, কারো আবার গো-সঙ্কট ; আবার, সে বৎসর একটা গ্রামে গিয়েছিলাম—পর্ব্বতাকার মাটির ঢিপির ওপর তারা ঘর বেঁধে বাস করে···আর বর্ষাকালে কোন্ একটা খাল দিয়ে নদীর জল ঢুকে' ধান-পান নষ্ট করে' ফেলে—তাদের সমস্যা ঐ খালটা···জলের বেগে কোনো বাঁধই টিকৃছে না।···কারো আবার তিন মাইল লম্বা এক খাল কেটে' দিতে পারলে সুবিধে হয়—বর্ষার জল বেরিয়ে গিয়ে আবাদ চল্‌তে পারে।···দেখ কি দুরূহ ব্যাপার।···তবে আমরা সাধারণ ভাবে শ্রেণীবিভাগ করে' নিয়েছি—ম্যালেরিয়া আর গোচারণ ভূমিই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে। একটাকে তাড়াব, আর একটাকে তৈরী ক'র্‌ব।···জিজ্ঞাসা কর্‌বে, কেমন করে তৈরী ক'র্‌ব ? ফসলের জমি যদি ফসল বেশী দেয়—ঢের বেশী—তবে লোকে খানিকটা জমি গরুর জন্যে উদ্বৃত্ত করে' রেখে দিতে অক্লেশেই পারবে।···ভূমিকে উর্ব্বরা করো—সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কি বলো তুমি ?

কালোশশী বলিয়াছিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

একদিন মাথা ধরায় বাবুটি গ্রামের উর্ব্বরা এবং অনুর্ব্বরা ভূমির আনুমানিক পরিমাণ লিখিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিয়াছিলেন··· মুর্গীর ডিমের দাম এখনও রহিমতুল্যার পাওনা আছে।

···তার পর তিন বৎসর কাহাকেও এদিকে দেখা যায় নাই। এবার বাবুরা আসিয়াছেন।

সেই দিনই—

তিন ভাই নদীর ধারে ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে ছোটবাবু সহসা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, "গোধূলি" শব্দটা তাঁর মনে পড়িয়া গেছে··· দিনান্তে প্রতিদিনই এই মনোরম লগ্নটা নিশ্চয়ই আসে, এখানে সেখানেও ; কিন্তু কলিকাতার পার্কে বেড়াইবার সময় ঐ শব্দটা কদাপি তাঁর মনে পড়ে নাই।···সূর্য্য এখন কোথায় তার ঠিক্ নাই—কিন্তু তাঁর বিপরীত প্রান্তে মেঘে মেঘে যে অগণিত বর্ণের মুহুর্ম্মুহুঃ গ্রহণ আর মোচন ঘটিতেছে তাহা কেবল আকাশের নয়, চোখের নয়, মনেরও সম্পদ

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন,—বড়-দা', আমি কবিতা লিখ্‌তে পারি বোধ হয়···দিন কতক এখানে থাক্‌লে না লিখে' পার্‌ব না···

—হঠাৎ ?

—দেখ্‌ছি তাই। 'গোধূলি' কথাটা ভারি মনে পড়ে' গেল ; আর মনে পড়ে' ভাল লাগ্‌ছে।

মেজবাবু ইংরেজিতে প্রকাশ করিলেন,—ভাল লাগার কারণ, মনে তোমার গোধূলির রূপ একটা ছিলই ; সেইটে এই সময়ে বাইরে তোমার নজরে পড়েছে···এটাকে কাব্যের উদ্গার বলা যায়। এ সময়ে অনেকের বিয়ের কথাও মনে পড়ে' যেতে পারে।

বড়বাবু বলিলেন,—আমার ভয় হচ্ছে, আমরা কিছুদিন এখানে থাক্‌লে লোকে প্রকাশ্যেই আমাদের ঘৃণা ক'রবে। আমরা এদের সঙ্গে মিশ্‌তে পারছিনে।

—তার বাধা ওরাই। বলিয়া মেজবাবু হাতের ছড়ি প্রবলবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন।

—না বলেই মনে হয়। ওরা যে সকাল বেলা এসেছিল, ঠিকই এসেছিল ; আমরা তাদের মনের ইচ্ছেটা ধর্‌তে না পেরে তাদের ক্ষুণ্ণ করেছি। · আমরা হস্তক্ষেপ না করায় যে জিতে' গেছে সে-ও সন্তুষ্ট হয় নি।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন,—কি করে' ভেতরকার এত কথা জান্‌লে ?

—যে সুদের টাকা কমাতে এসেছিল, সে ডিক্রীদারকেও সঙ্গে এনেছিল · অত সহজে সে মুস্কিলে পড়্‌তে আস্‌ত' না যদি মনে মনে একটা কিছু সম্ভোগের আশা তার না থাক্‌ত'।···আমরা প্রচণ্ড একটা কথা কাটাকাটি ঝগ্‌ড়ার পর তাকে জিতিয়ে দিলে সে লাফাতে লাফাতে যেত'··· জিতে তার সুখ হয় নি'।···ঢোঁড়া সাপকে দেখে' মানুষ হাসে ; অতি নিরীহ লোককে মানুষ অবজ্ঞা করে' বলে ঢোঁড়া ; কিন্তু গোখরোকে দেখে ভয় পেলেও তার উগ্রতাকে ভালবাসে।

মেজবাবু বলিলেন,—তুমি মনস্তত্ত্ববিদ্‌ তা জান্‌তাম না।·· এবার কেউ এলে 'ফুল্‌ বেঞ্চে' ফেলে' খানিক লাঠালাঠি করে' কাজের গৌরব বাড়িয়ে অবশেষে তাকে ছুব্‌লে দেওয়া যাবে।

ছোটবাবু বলিলেন,—তা' দিও ; কিন্তু এদিকে আমি যে দেউলে হ'য়ে যাচ্ছি !

—কিসে ?

—নদীতে যদি স্রোত না থাকে, তবে বড় শোচনীয় হয় না !···মনে হ'চ্ছে, গ্রামটারই যেন নাড়ী বসে' গেছে···গেছেও তাই। এমন সুন্দর

সময়ে নদীর ধারটিতে কেউ বেড়া'তে আসে নি'—ঘরে বসে' মশার কামড় খাচ্ছে।

বড়বাবু বলিলেন,—তারা আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়েই নদীর ধার দেখ্ছে···রোজ রোজ কি আর নূতন জিনিষ দেখ্তে আস্বে!···

শুনিয়া ছোটবাবু ভাবিলেন, ইহাদের একটি চক্ষুষ্মাণ অভিভাবক চাই—যে নিজের চক্ষে দেখিয়া উহাদের দেখাইবে প্রকৃতির এই চরম প্রফুল্লতা।

বড়বাবু বলিতে লাগিলেন,—এখানকার ডাকঘরের কেমন বন্দোবস্ত জানিনে—কাগজখানা পেলাম না। 'এ্যাপ্রুভারের কন্ফেসনটা' বেশ 'ইন্টারেষ্টিং' হ'চ্ছে।

মেজবাবু। কোন্ কেস্টায়?

বড়বাবু উত্তর-ভারতের একটি প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের মাম্লার নামোল্লেখ করিলেন; বলিলেন,—'এ্যাসটাউণ্ডিং ডেভালপমেণ্ট্স্' হবে বলে' মনে হ'চ্ছে।

মেজবাবু বলিলেন,—চল ক'লকাতায় ফিরে যাই; জ্যাঠা-মশায় অসন্তুষ্ট হ'লে কি আর করা যাবে।

সংবাদপত্র না পাওয়ায় বড়বাবু সায় দিলেন; বলিলেন,—আমারও যাবারই ইচ্ছে। এখানে বসে' তিনদিনেই আমরা এত পিছিয়ে যাব যে, ক'লকাতায় গেলে মণ্টু আমাদের নতুন খবর দেবে।

মণ্টু বাবুদের পাঁচ বৎসর বয়স্কা ভগিনী-কন্যা।

এ-কথাটা সবারই মনঃপূত হইল—

নূতন নূতন আবিষ্কারের সংবাদ আর দেশ-বিদেশের মনীষীগণের

বাণী নিত্য প্রচারিত হইতেছে—তাহার একটি একবার অজ্ঞাতে ঘটিয়া গেলে বিশ্বের নাগাল আর পাওয়া যাইবে না…'ফ্যাসানে' পিছাইয়া পড়ার মত বর্ব্বরতা আর কিছু নাই।

তিনজনেই সমান শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

একটা ছাগল চরিয়া বেড়াইতেছিল—

সে পেট ভরাইবে সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছিল; তার সে সঙ্কল্প সারাদিন চরিবার পরেও তেম্‌নি সতেজ আছে বলিয়া মনে হইতেছে… দূরের একটা ঘাটে নামিয়া দুইটি স্ত্রীলোক জল লইয়া যাইতেছে… দূরে নদীর যেখানে বাঁক ঘুরিয়াছে সেখানে কয়েটি বাব্‌লা গাছ—তার নীচে একটা বাঁশ আর একটা বালিশ পড়িয়া আছে…

ছোটবাবু বলিলেন,—সে স্ত্রীলোকটি আজ আবার কাঁদ্‌লে আমি তার কাছে গিয়ে তাকে দেখে' আস্‌ব।…মড়া-কান্নায় হঠাৎ ভয় করে, কিন্তু এমন করে' জড়িয়ে ধরে না!

সেই অন্ধকারই আসন্ন দেখিয়া তিন ভাই নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া চা-পানের সময়েও এখানকার কথাই চলিতে লাগিল।

মেজবাবু বলিলেন,—লক্ষ্য করেছ, বড়-দা, এখানকার সকলেরই মুখের চেহারা যেন একই রকম!

বড়-দা বলিলেন,—হ্যাঁ।…তারপরই বলিলেন,—তা' অত লক্ষ্য করিনি।'…কেন এমন হ'ল!

—সবাই সমান নির্ব্বোধ বলে'।…সব গরুরই মুখের ছাঁদ একই

রকম, সব গরুই সমান গরু বলে'···বুদ্ধির তারতম্য থাকলে চেহারাও আলাদা আলাদা হ'ত।

বড়বাবুর তখন মনে হইল, কথাটা ঠিক।

মেজবাবু পুনরায় বলিলেন,—তুমি তখন বল্‌ছিলে, ওদের অভি-যোগের বিচার করে' দিইনি বলে' ওরা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে গেছে।···কিন্তু, আমরা একজনকে আতঙ্কিত করে' আর একজনের কার্য্যোদ্ধার করে' দেব এ-র কোনো যুক্তি আছে কি!

বড়বাবু স্বীকার করিলেন,—তা' নেই।

ছোটবাবু বলিলেন,—আমি নাস্তিক নই, কিন্তু মনে করি, মানুষ নিজেকে কোনোদিন একেবারে অসহায় মনে না করলে ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা ক'রত না।···লোকগুলি ভগবানের একটি গুণ আমাদের প্রতি আরোপ করেছে—তিনি ত্রাতা।

মেজবাবু বলিলেন,—ত্রাণ করবে কাকে!···খবরের কাগজ পড়ে' যা' জান্‌তে পারি আর যতদুর শোচনীয় মনে হয়, স্বচক্ষে দেখে' তেমন মনে হ'চ্ছে না ত'!···কাগজে লেখে, এরা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত—কিন্তু কই! একটা ছোট ছেলে কবে মরেছিল তার মায়ের কান্না শুন্‌লাম··· আর ত' কেউ মরার কথা বল্‌লে না।

বলে নাই সত্য—

কিন্তু তল্লাস করিলে চিত্রগুপ্তের খাতার কি খবর বাহির হইয়া পড়িতে পারে তাহা জানিবার কথা কাহারও মনে পড়িল না···পড়িলেও, কার্য্যানুরোধে অঙ্কপাত আর গবেষণার শ্রম, আর ঐ হিসাবের অনু-সন্ধানে কালচক্রের অনুধাবন করা সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ।

বড়বাবু ভাবিতেছিলেন ; বলিলেন,—চেহারার কথা কি বল্‌ছিলে ? সব একরকম ? তা' কি হয় !···তবে শিক্ষা পায়নি' বলে' তাদের মুখ আমাদের পছন্দ হয় না। · কালোশশীর দেখা পাওয়া যায় নাই সমস্ত দিন···

ছোটবাবু বলিলেন,—চমৎকার 'টাইপ্'·· গাঁয়ের লোক নিজেকে চালাক্ মনে কর্‌লে ঐ রকমই দাঁড়ায়—গরু চরান'র মত করে' মানুষ চরা'তে চায়—আমাদের চরাবার চেষ্টাটা দেখেছ' .ত' !···ওর ওপর নির্ভর করাও যায় না, নির্ভর না করেও উপায় নেই—বেশ কিন্তু !

মেজবাবু বড়বাবু উভয়েই হাসিয়া বলিলেন,—হুঁ ।

এবং সেই সময়েই কালোশশী, হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া আর হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত ধূলা মাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইল···গরুর গাড়ী ধূলা উড়াইয়া চলিয়া গেছে—মাঠের ধূলা কালোশশীর চুলে আর ভুরুর উপরেও স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছে···

বড়বাবু বলিলেন,—এই যে ! তোমার কথাই হচ্ছিল।

কালোশশী পুলকে আপ্লুত হইয়া গেল ; বলিতে লাগিল,—পরম সৌভাগ্য আমার ; ধন্য আমি।···এই আস্‌ছি সাত কোশ পথ হেঁটে···আসা যাওয়ায় একদিনে আঠাশ্ মাইল ; আপনারা গাড়ী ঘোড়ার দেশের মানুষ—আঠাশ্ মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছে শুন্‌লে বোধ হয় অবাক্ হ'য়ে যাবেন। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলা থেকে এই অভ্যাস। বলিয়া কালোশশী বাবুদের তুলনায় নিজেকে ক্ষুদ্র প্রমাণিত করিয়া হাসিতে লাগিল।

ছোটবাবু বলিলেন,—বসো।

—না, বাবু, বস্‌ব' না এখন···আপনারা কেমন আছেন তা-ই এক নজর দেখ্‌তে এলাম। ভালই আছেন দেখে খুশী হ'ল মনটা।··· আপনারা দেশের লোক হ'লেও আমাদের ত' চেনেন্ না—আমরা ভাই অতিথি মনে করে' ভাব্‌ছি, সৎকারের ত্রুটি না হয়।···সরাসর তা-ই এখানেই এলাম···

—আবার আস্‌বে ত' একবার ?

—কিন্তু ততক্ষণ আপনাদের বোধ হয় আহারাদি শেষ হ'য়ে যাবে। ···যদি তাড়াতাড়ি করে' আস্‌তে পারি—

—না তাড়াতাড়ি করতে হবে না···এই টাকা পাঁচটি সেই ঠাকুর মশায়কে দিও, কাল যিনি এসেছিলেন—

—তাঁকেই ··

—তাঁর অসুখ করেছে শুন্‌লাম।

—তবে দেন আমাকেই···এই পায়েই তাঁকে দিয়ে যাব। অসুখে-বিসুখেই দেশটা গেল।—বলিয়া কালোশশী পাঁচ টাকার নোটখানি লইয়া, আবার মৌখিক বিদায় লইয়া এবং আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল···

সে অদৃশ্য হইতেই ছোটবাবু হঠাৎ হা-হা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন···

কালোশশীর আকার ক্ষুদ্র—কিন্তু কেমন করিয়া সে আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত এক সময়েই চারি-চতুর্দ্দিকে জড়ে-জীবে নিজেকে চিহ্নিত করিয়া ফিরিতেছে!—ধূর্ত্তের সর্ব্বঘটে স্থিতিই ছোটবাবুর হাসির বিষয়।

# পরিচ্ছেদ ৮

সন্ধ্যার পর বাতাস উঠিল…

ওদিকে অভয় কন্যাকে লইয়া সঙ্কটাপন্ন—

এদিকে কোথাকার একটা ছিদ্রের ভিতর সবেগ বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া সিটির মত বাজিতেছে…অন্ধকারে গাছের পাতার আন্দোলন দেখা যাইতেছে না—একটা খর্‌খর্‌ শব্দ উঠিয়া কখন হঠাৎ, কখন ক্রমে ক্রমে মৃদুতর হইয়া নিশুতি হইয়া যাইতেছে…নিকটে একটি সুরু করিতেই যেন অসংখ্য প্রাণ সেই পুলকে সরব হইয়া উঠিল…বাবুরা জানিতেন না যে শৃগালের স্বভাবই ঐ।…দূরের একটা জঙ্গল হইতে আর একদল তার "উতোর গাহিয়া" গেল—

ছোটবাবু মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

একটা জোনাকি ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া ছোটবাবুর টেবিলের উপর বসিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল—ছোটবাবু দেখিলেন, তার নীলাভ আলোটা নিবিয়া নিবিয়া জ্বলিতেছে…

নাড়া পাইয়া গাছ হইতে একটি ফল টপ্‌ করিয়া মাটিতে পড়িল—শব্দটা ছোট, কিন্তু চারি দেয়ালের ধাক্কায় সে ঘরের ভিতর স্ফীত হইয়া উঠিল…

ছোটবাবু বলিলেন,—এখানে ভৌতিক শব্দের খুব প্রাদুর্ভাব দেখ্‌ছি; আমাদের ত্রিসীমানায় জীব আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু শব্দ হচ্ছেই।

মেজবাবু মাসিকপত্র পাঠ করিতেছিলেন ; তিনি কথা কহিলেন না ; বড়বাবু কলিকাতার চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন—তিনিও কথাটা কানে তুলিলেন না।

ছোটবাবু "অর্গ্যান" বাজাইয়া একটি গজল্ গাহিলেন—তাহাতে মিনিট পনর' গেল ; তারপর কি করা যায় ভাবিতেছেন, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আসিয়া ঘরের আলো যেখানে শেষ হইয়াছে আর বাহিরের অন্ধকার সুরু হইয়াছে ঠিক্ সেই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইল···

—কে ?···ছোটবাবু প্রশ্ন করিলেন আগন্তককে ; বড়বাবু এবং মেজবাবু প্রশ্ন করিলেন তাঁহাকে,—কে !

—স্ত্রীলোক একটি।

শুনিয়া উভয়ে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

স্ত্রীলোকটি নিঃশব্দে সিঁড়ি'বাহিয়া উঠিয়া আসিল ; কাহাকে যেন বলিল,—ওঁদের সবাইকার পায়ের ধূলো নে।···আমি ছোঁব না আছাড়া কাপড়ে।

আট কি নয় বছরের একটি সুদর্শন ছেলে স্ত্রীলোকটির পশ্চাদ্দিক্ হইতে সম্মুখে আসিয়া সলজ্জ মুখে এক এক করিয়া বাবুদের পায়ের ধূলা লইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাবুরা চাহিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি বিধবা···অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিত মুখের শ্রী যতটা লক্ষিত হইল ততটা অসুন্দর নয়, চপলও নয়।

বড়বাবু কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি চাই তোমার ?

স্ত্রীলোকটী কিয়দ্দূরে মেঝের উপর বসিল—

বাবুরা বুঝিলেন, দুই-এক কথায় শেষ হইয়া যায় এমন রহস্য কি

সমস্যা লইয়া সে আসে নাই—কিছু সময় লইবে ; না বলিতেই তাই বসিল।

কিন্তু স্ত্রীলোকটি সহসাই তার বক্তব্য সুরু করিতে পারিল না··· কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে নিঃশব্দ থাকিয়া অধোমুখেই সে বলিল,—অপরাধ নিও না, বাবা, আমি গরীব বিধবা।—বলিয়া সে দুই করতল একত্র করিয়া একটি প্রণাম নিবেদন করিল, কি মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল, তাহা ঠিক্ পরিষ্কার হইল না···কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই ওঁদের মনে হইল, যাহাই বলুক, গুছাইয়া বলিবে।

প্রণামান্তর সে বলিতে লাগিল,—আমি যে কথা তোমাদের কাছে বল্‌তে এসেছি, বাবা, প্রাণের ব্যাকুলি অসহ না হ'লে মানুষে তা' পরের সুমুখে মুখে আনে না।···সে কথা বল্‌বার নয়···

বড়বাবু ইতিপূর্ব্বে মনে মনে শপথ করিয়াছিলেন যে, বক্তব্য ব্যক্ত করিবাব কাজে কাহাকেও বাধা দিবেন না, শেষ পর্য্যন্ত শুনিবেন—নিজের আবেগে বক্তা যাহাই বলুক, যতই তা' অসংলগ্ন, শ্রুতির অযোগ্য হউক।

স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিল,—সে কথা বলা কেবল ঘরের লজ্জার কথা বলা নয়, তোমাদের সাদা মনে কলঙ্কের ছাপ দে'য়া হবে।···বলিয়া স্ত্রীলোকটি থামিয়া বোধ করি ঘৃণ্য কাহিনীর বলিবার স্পষ্ট অনুমতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বড়বাবু বলিলেন,—তোমার যত কিছু বলবার আছে বলো—শুন্‌তে আমাদের আপত্তি বা অনিচ্ছা নেই। তুমি স্ত্রীলোক হ'য়ে অসঙ্কোচে যা' বলবে তা' খুব অশ্রাব্য হয়তো হবে না।

স্ত্রীলোকটি মৃদু একটু হাসিল; বলিল,—আমারই মেয়ে আর জামাইয়ের কথা—

—জামাই বুঝি নেয় না মেয়েকে? বলিয়া ছোটবাবু অর্গ্যানের ডালা বন্ধ করিলেন।

তাঁহারই দিকে এক মুহূর্ত্ত দৃষ্টি তুলিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল,—নেয় না, কিন্তু তাই আমার বল্‌বার কথা নয়।

—বল্‌বার কি তা' বলো।—বলিয়া ছোটবাবু অর্গ্যানের টুল ছাড়িয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন—মেজবাবুর সেই 'ফুল্ বেঞ্চ্' ঝাঁকিয়া উঠিল।

—আমার মেয়ের যখন বিয়ে দিই তখন তার বয়েস মাত্তর এগারো, আর জামাইটির বয়েস ছত্রিশ্। জামাইয়ের ঘর-দুয়োরের অবস্থা ভাল, আর ক্ষেত্-খামার আছে; ভেবেছিলাম, মেয়ে সুখেই ঘরকন্না করবে; কিন্তু অদেষ্টের আপদ্ যে সঙ্গেই ছিল তা জান্‌তাম না।··· বলিয়া স্ত্রীলোকটি ক্ষণেক থামিয়াই বলিল,—জামাইয়ের একটি—

বলিয়া স্ত্রীলোকটি থামিয়া রহিল—

বড়বাবু শালীনতা অতল জলে নিক্ষেপ করিয়া চোখ বুজিয়া বলিলেন,—রক্ষিতা ছিল?

—ছিল, বাবা; বহু পূর্ব্ব হতেই।···জামাইয়ের ঘর আর আমাদের ঘর আর তার ঘর এই গ্রামেই; তবু আমরা তা' জান্‌তাম না।··· মেয়ে শ্বশুর-ঘরে দু'মাস থাকে, আমার কাছে আসে, আবার যায়, আবার আসে।···মেয়ের বয়েস বাড়্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু বয়েস তার গায়ে ফুট্‌ল না—

মেজবাবু কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—তার মানে ?

কিন্তু ছোটবাবু আর বড়বাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহারা কেহ কাহারো চোখের দিকে চাহিতে পারিলেন না…

স্ত্রীলোকটি বলিল,—বেটাছেলের বয়েস হ'লে গোঁফ দাড়ির রেখা দেয়, মেয়েছেলেরও গায়ে তেম্‌নি—

মেজবাবু বলিলেন,—ও। তারপর ? বলিয়া কথাটাকে ফিরাইয়া দিয়াও লাল হইয়া উঠিলেন।

—মেয়েকে সে একবার মেরে-ধরে' তাড়িয়ে দিলে ; আমি গেলাম বল্‌তে-কইতে—আমাকেও সে হাত তুলে' মার্‌তে এল।

ছোটবাবু প্রশ্ন করিলেন,—তার মা, বাবা নেই ? অর্থাৎ তোমার মেয়ের শ্বশুর-শ্বাশুড়ী নেই ?

—শ্বশুর নেই, শ্বাশুড়ী আছে ; কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে—সে অন্ধ। তার সোয়ামীর পারার দোষ ছিল—

ছোটবাবু চোখ্‌ নামাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন,—যাক্‌।… আসল কথাই বলো।—বলিয়া ছোটবাবু মনে মনে শপথ করিলেন, পাশে খাল কাটিয়া গল্পের মূলস্রোতের শাখা বাহির করা ঠিক্‌ নয়, অতএব আর করিবেন না।

—খুব একটা সোরগোল হ'য়ে গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে' গেল—মনের লজ্জায় মান্‌ষের সাম্‌নে তখন আমি মুখ তুল্‌তে পারিনে।…দশজনের কথায় জামাই মোটে আমল দিলে না—বল্‌লে, কর্‌তে হয় একঘরেই করো, তবু ঐ কেঠো-পুতুলকে আমি ভাত-কাপড় দিয়ে পুষ্‌ব না… বলে' সে তার জিনিষ পত্তর নিয়ে তুল্‌লে সেই মেয়েটির বাড়ীতে—

এ বাড়ী তালাবন্ধ রইল।···দশজনের পরামর্শে তখন মেয়েকে দিয়ে জামাইয়ের নামে খোরপোষের নালিশ করালাম ; নুটিশ্ পেয়ে জামাই গিয়ে জবাব দিলে যে, 'ওর চরিত্তির ভাল নয়, 'ওকে আমি ত্যাগ করেছি ·· বাড়ীর ছোটলোক-বাগ্দী রাখালের সঙ্গে ওর প্রেণয় আছে।···কিন্তু আদালতের হাকিম তা' শুন্‌লেন না—বল্‌লেন, সব মেয়েকেই সতী বলে' ধরে' নিতে হবে—অসতী প্রেমাণ কর্‌তে এমন প্রেমাণ চাই যার আর কাটাই নেই।···পরিবারকে খাওয়া-পরা দিতে সোয়ামী বাধ্য··· আর চৌকিদারের এজাহারে পষ্ট জানা যাচ্ছে ঐ লোকটা ঐ বাড়ীতে রাত্রে যাওয়া-আসা কর্‌ত—এখন সব্বদাই থাকে। আর স্ত্রীর উপর যদি তার ভালবাসাই থাক্‌বে তবে শত্তুর সেই বাগ্দীটাকে এখনো রেখেছে কেন ?···বলে' হাকিম আমার মেয়েকে মাসে মাসে আট টাকার খোরপোষের বরাদ্দ করে' দিলেন—বাংলা মাসের পয়লা টাকা দিতে হবে · মেয়ের দাবিও ছিল তা-ই। পাঁপরের মাম্‌লার খরচাও তাকে দিতে হ'ল অনেকগুলো টাকা—সে সরকারের টাকা, তখনি তারা আদায় করে' নিয়েছে।···

মাসে মাসে আট্‌টা করে' টাকা গুণে' দে'য়া বড় কঠিন। জামাই তখন আমার কাছে এসে কেঁদে পড়্‌ল ; হাত-পা জড়িয়ে ধরে' বল্‌লে,—আমার অপরাধ হয়েছে, মা, ক্ষমা করো ; তোমার মেয়েকে তুমি পাঠিয়ে দাও—আর আমি তাকে কিছু বল্‌ব' না।

আমি বল্‌লাম,—বাপু, তুমি ফাঁদে পড়েই পা ধরতে এসেছ। আমার মেয়েকে তুমি যে কলঙ্ক দিয়েছ তাতে তোমার মুখ দেখ্‌তেই

নেই—তোমাকেও ধিৎকার, আমার মেয়ের অদেষ্টকেও ধিৎকার।···
মেয়েও বল্‌লে, ও-র ঘরে আমি আর যাবো না।

জামাই সেদিনকার মত মুখ বুজে' চলে' গেল; তার পরদিনই আবার এল প্রাণ্‌নাথ ঠাকুরকে সঙ্গে করে'। ঠাকুরকে আপনারা জানেন··· আপনাদের কাছে তিনি এসেছিলেন শুনেছি।···তিনিই ছিলেন জামাইয়ের দক্ষিণহস্ত—তাঁর বুদ্ধি নিয়েই জামাই মেয়ের নামে বাগ্দী অপবাদ দিয়েছিল; মাম্‌লাতেও তিনি জামাইয়ের হয়ে সাক্ষী দিয়েছিলেন—প্রেধানই ছিলেন তিনি।

মিনিট্‌-দশেক্‌ আগেই এই পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণকে পাঁচ টাকা সাহায্য পাঠান' হইয়াছে—মেজবাবু আর বড়বাবু ছোটবাবুর উপর একবার সঙ্কেতময় দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিলেন—

ছোটবাবু একটু হাসিলেন মাত্র—

জ্যেষ্ঠদ্বয়ের অসাক্ষাতে এই দানটা না করিলেও দান সম্বন্ধে কালব্যয় করা ইংরেজি প্রবচন অনুসারে ক্ষতিকর মনে করিয়া তিনি ইচ্ছার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করিয়াছিলেন—দাদাদের পরামর্শ লয়েন নাই—পরামর্শের ব্যাপারই বা কি এমন!

স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিল,—প্রাণ্‌নাথ ঠাকুরও অনেক নরম নরম কথা ক'য়ে মেয়েকেও রাজি কর্‌লেন, আমাকেও রাজি কর্‌লেন। বল্‌লেন, তোরা এখনও একঘরে' হ'য়ে আছিস্‌ ত? তোদের আমি জাতে তুলে' দিচ্ছি দাঁড়া।

আমি বল্‌লাম, তুমি একবার জামাইয়ের টাকা খেয়ে আমাদের একঘরে করেছিলে; এখন আবার তারই টাকা খেয়ে ঘরে তুল্‌তে

এসেছ !···ঘর আমরা চাইনে ; তবে অত করে' যখন বল্‌ছ তখন মেয়ে পাঠিয়ে দেব, কেন না শ্বশুরঘরই মেয়েমানুষের তীথ্য।

জামাই নিজের বাড়ীর তালা খুলে' তার জিনিষ-পত্তর এই বাড়ীতে আন্‌লে—মেয়েকে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলাম···

আজ তিনদিন হ'ল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ; কিন্তু মেয়ে আজ দুপুরে আবার কেঁদে'-কেটে' আমার ঘরে পালিয়ে এসেছে।

মেজবাবু বলিলেন,—মেরেছে বুঝি ?

স্ত্রীলোকটির চোখে জল টল্‌টল্‌ করিতে লাগিল···বলিল,—মার্ ত' ভালই, বাবা ; হাজার গুণে ভাল···আপন পরিবারকে কে না মারে ! পাড়াগাঁয়ে পরিবারকে মারা এমন গা-শিউরণো কথা নয়। কিন্তু—

বলিয়া স্ত্রীলোকটি একটু থামিয়া মুখ ফিরাইয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া লইল ; তারপর বলিল,—সেই ছোটলোক বাগ্দীটা, জামাইয়ের গরুর রাখাল সে বেটা—তার নামের সঙ্গে মেয়ের নাম জড়িয়ে জামাই খোরপোষের মাম্‌লায় জিত্‌তে চেয়েছিল—সে বেটা সুবিধে পেয়ে গেল··· মেয়ের মুখের দিকে সে কেমন করে' তাকায়, তাকিয়ে কেমন করে' হাসে—মেয়ে তা' সইতে পার্‌ল না···

—জামাইকে বলেছ ?

—সে জানে। তারই উস্‌কানিতেই বাগ্দীটা কর্‌ছে ও কাজ, নতুবা সাহস পাবে কোথায় !—বলিয়া স্ত্রীলোকটি নীরব হইয়া রহিল···

ছোটবাবুর ক্ষুব্ধ অন্তরে অজ্ঞাতা বধূর ক্ষুব্ধ অন্তরের ধিক্ ধিক্ প্রতিধ্বনি বাজিতে লাগিল ; এবং স্ত্রীলোকটির এই ক্ষেত্রে যাহা যাজ্ঞা তিনিই তাহা প্রকাশ করিলেন ; বলিলেন,—এমন অভদ্র আচরণের

কথা আমরা আগে কখনো শুনিনি—সম্ভব যে তা-ও হঠাৎ মনে কর্‌তে পারছিনে।…তোমার জামাইকে আর বাগ্দীকে ডেকে শাসন করে' দেব এই কি তোমার ইচ্ছে ?

স্ত্রীলোকটি মাথার কাপড় আরো একটু টানিয়া দিয়াছিল ; মাথা নাড়িয়া জানাইল, ঐ তার ইচ্ছা বটে।

—তোমার গ্রামের লোকে তাকে শাসন করতে পারে না কেন ?

—ধমক্ ধামক্ দিতে পারে ; কিন্তু সূক্ষ্ম কথাকে তারা ছোট মনে করে, আর চোখের ইসারাকে তারা সূক্ষ্ম মনে করে…

মেজবাবু অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—ছি, ছি !…এই স্থানে জ্যাঠামশায় আমাদের বাস কর্‌তে পাঠিয়েছেন ! তারপর ছোটবাবুকে উদ্দেশ করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন,—তুমি উত্তেজিত হ'ও না।

ছোটবাবুও নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন…

বিসর্জ্জনের পর সুগঠিতা বহুবর্ণা প্রতিমাকে জলের উপর টানিয়া তুলিলে যেমন দেখা যায়, তাঁহাদের শ্রীময়ী ভাবমূর্ত্তি তেম্‌নি শ্রীহীনা হইয়া এই নীরবতার মাঝখানে বিরাজ করিতে লাগিল…অন্তঃস্রোতে তার সমুদয় বর্ণ-অলঙ্কার রূপ-পরিচ্ছদ ধুইয়া গেছে…শুধু রূপহীনতাই তার চরম দুর্গতি আর বিকৃতি নহে—তার অভিশপ্ত দেহ যেন দুরারোগ্য ক্ষত লইয়া দেখা দিয়াছে…

গোধূলিজাত রসাত্মক বাক্যের পিপাসা ছোটবাবুর আর অনুভূত হইতেছে না ; স্ত্রীলোকটিকে শেষ ও সুসঙ্গত কি কথাটা বলিয়া দেওয়া যায়, বড়বাবু তাহাই চিন্তা করিতেছেন এবং মেজবাবু নিরপরাধী জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি ক্রোধ দমন করিতেছেন, এমন সময় কান্ত বিশ্বাস

চেনা পথ দিয়া অন্ধকারেই ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াই চোখে হঠাৎ প্রখর আলো লাগায় থমকিয়া চোখ পিট্‌পিট্ করিতে লাগিল। মুখে বলিল,—ধাঁ করে' আলোটা বড় চোখে লেগেছে। বলিয়া স্পষ্ট করিয়া চোখ খুলিয়া বলিল,—বাবু, শীগ্‌গির আসুন—অভয় তার মেয়েকে খুন করেছে।—বলিয়া বাবুদের মুখের দিকে নিষ্পলক-চক্ষে চাহিয়া সে ক্রমাগত হাঁপাইতে লাগিল…এই হাঁপানিটাও অবশ্য গল্প-গঠনের উপাদানের মধ্যেই—

সংবাদটা সহসা প্রবেশ করিয়া বাবুদের মনের কোথায় যাইয়া পড়িল তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন; কিন্তু যা' রুদ্ধ হইলে মানুষ একেবারে বাঁচে না সেই নিঃশ্বাস ব্যতীত সচেষ্ট প্রাণময়তার লক্ষণ তাঁহাদের আর কিছুই রহিল না…

সেই স্ত্রীলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল—

কান্ত বিশ্বাস বলিল,—অভয় নদী সাঁতরে' পালিয়েছে দেখেই আমি আস্‌ছি…আমি চল্‌লাম, কালোশশীকে ডেকে' নিয়ে আসি আপনাদের কাছে। বলিতে বলিতে যেমন হঠাৎ সে আসিয়াছিল তেম্‌নি হঠাৎ বাহির হইয়া গেল…বাহির হইয়া সে ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

স্ত্রীলোকটি বাবুদের মুখের দিকে একবার চাহিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল…তার আর কিছু শুনিবার কি বলিবার নাই—পিতা কর্ত্তৃক পুত্রী হত্যার কাছে জামাতৃ কর্ত্তৃক কন্যার নিগ্রহ অনুপাতে একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেছে।

তিন ভাই কেবল বসিয়া রহিলেন—একটা পতঙ্গের গুঞ্জরণ ঘরের ভিতরটা পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল…একোদ্দিষ্ট একটা ফলকের

মত বাতাসের সিটি যেন চোখের সম্মুখে উন্মীলিত হইয়া রহিল···পাতার শব্দ উতরোল হইয়া একটানা বহিতে লাগিল···

কিন্তু সংবাদটা মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয় ভগবান তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন—বুকে ধড়ফড়ানির যন্ত্রণাটা দিলেন না···"খুন" শব্দটা বার্ত্তাবহ যে ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিয়াছিল সেই ভঙ্গীটা ছোটবাবুর চোখের সাম্‌নে মূর্ত্ত হইয়া ভাসিতে লাগিল···মেজবাবুর মনে পড়িতে লাগিল, কালোশশী সৎলোক বলিয়া প্রশংসাপত্র দিয়া একটি চুপ্‌চাপ্ লোক্‌কে অভয় বলিয়া পরিচিত করিয়া দিয়াছিল···

কিন্তু সকলের চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা হইল বড়বাবুর—

একজনের হাতের ধারাল' কাটারি, আর একজনের তুঙ্গ কণ্ঠ, তৃতীয় ব্যক্তির হস্ত—সবগুলি জড়াইয়া একটি ত্রিশৃঙ্গ ত্রিশূলের মত এককর্ম্মা একধর্ম্মী হইয়া যেন একই ক্ষেত্রে হত্যারঙ্গে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে··· তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন···

খানিক পরে ছোটবাবু বলিলেন,—বড়দা, প্যাক্ করতে বলি ?

বড়বাবু আর মেজবাবু উভয়েই বলিলেন,—বলো।

রামহরিকে ডাকিয়া ছোটবাবু জিনিষপত্র গুছাইতে বলিয়া দিলেন ; আর বড়বাবু বলিয়া দিলেন, কেহ যদি ডাকে তবে হাঁকাইয়া দিবি।

## পরিচ্ছেদ ৯

তিন জনে সাইকেলে উঠিতেছেন, এমন সময় জামাই-কন্যা-কাহিনী-উক্ত প্রাণনাথ-ঠাকুর উত্তরীয়ে অসুস্থ দেহ এবং সুবর্দ্ধিত টিকি আবৃত করিয়া আসিয়া দেখা দিলেন···

তখন সকাল ছ'টা—

কিন্তু পথ চল্‌তি লোকের মুখে পাড়াগাঁয়ে সংবাদ খুব ত্বরিত বেগেই রটে।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন,—যাচ্ছি, ঠাকুর। টাকা ক'টি পেয়েছেন?

টাকার কথাটা না বলিলে বাবুদের যাইবার কারণানুসন্ধান করিয়া সময়োপযোগী ক্ষোভ প্রকাশ প্রাণনাথ ঠাকুর নিশ্চয়ই করিতেন; সে আক্কেল তাঁর আছে; কিন্তু টাকার কথায় তিনি চম্‌কিয়া উঠিলেন এবং মানুষের এই—আসিয়া এই-যাওয়ার দুঃখটা সেই চমকে বিদ্ধ হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল···বলিলেন,—টাকা! কই না!

—কালোশশীর হাতে দিয়েছি।

শুনিয়া ঠাকুরের হতাশার কিছু বাকি রহিল না—মুখ-চোখ বসিয়া গেল; রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—কালোশশীর হাতে দিয়েছেন! সে আর পাব না, বাবু। কালোশশীর হাতে টাকা পড়্‌লে সে টাকা আর বেরোয় না।

বাবুদের সাইকেল চলিতে লাগিল।

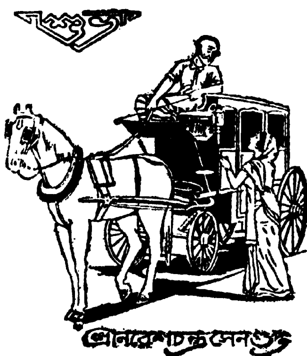
সমাপ্ত

১৩৩৪

## ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত পুস্তকাবলী




মূল্য দুই টাকা




মূল্য—দুই টাকা

## গ্রামের কথা

চারিটী বিভিন্ন গল্পে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াও ইহা একটী সামাজিক সমস্যাপূর্ণ ধারাবাহিক উপন্যাসের স্থান অধিকার করিয়াছে। মূল্য—২৲ টাকা।

## মিলন-পূর্ণিমা

রেখা ও সৌরীনের নির্ম্মল ভাব পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র। মূল্য—২৲ টাকা।

## দূরের আলো

উপেনবাবুর মত যুবক, কুমুদিনী ও চিত্রার মত মহিয়সী নারীচরিত্র অতি সুন্দর এবং মর্ম্মস্পর্শী।

মূল্য—২৲ টাকা




মূল্য আড়াই টাকা

## দুষ্টগ্রহ

ভাগ্য বিপর্য্যয়ের অদ্ভুত চিত্র—২৲ টাকা

---

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

# শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর পুস্তকাবলী

প্রায় তিন শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী রঙীন
প্রচ্ছদপটে অপূর্ব্ব বাঁধাই
সুন্দর উপন্যাস




মূল্য—২৲ টাকা

## বঙ্গপল্লী—২॥০

মৃতপ্রায় বঙ্গপল্লীকে সঞ্জীবনী সুধায় সিক্ত করিতে এই উপন্যাসখানি
—প্রকাশিত হইল—

## নূতন যুগ—১॥০

এই উপন্যাসে পাত্র পাত্রী বেশী নাই, কিন্তু যাঁহারা আছেন তাঁহাদের চিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। সম্বা, দীপিকা, বিন্দুবাসিনী, শিরীশ সকলই আদর্শ চরিত্র।

## তরুণের অভিযান ১॥০

সমাজের গতি ও আমাদের শিক্ষা যে-ভাবে চলিতেছে—তাহার পরিণতি কোথায়, লেখিকা মহোদয়া ঘটনা-বৈচিত্র্যময় কাহিনীতে এই উপন্যাসেই তাহা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন।

## পথের শেষে—২৲

আমাদের সংসারের সুখ দুঃখের কথায় ভরা।

---



বাক্‌দত্তা কন্যার সুন্দর চিত্র
—চারি শতাধিক পৃষ্ঠা—
মূল্য—২॥০ টাকা

---

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা